LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭২ বর্ষ ■ ১৮শ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ ■ ১৭ চৈত্র, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ ■ ১৪ রবিউস সানী, ১৪৩১ হিজরি ■ ৩১ আমান, ১৩৮৯ হি. শা. ■ ৩১ মার্চ, ২০১০ ঈসাব্দ

নোয়াখালী জেলার অম্বরনগর জামা'তে ১৭ মার্চ ২০১০ অনুষ্ঠিত হয় সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুরের ২য় সালানা জলসায় আগত দর্শক ও মেহমানদের একাংশ

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা–মুক্তি
পরম কাঙ্ক্ষিত অমূল্য এক সম্পদ

মার্চ মাস এলেই বাঙালি জাতি নতুন করে জেগে ওঠে। অগ্নিঝরা এ মাস বাঙালির স্মৃতিতে অমলীন, অম্লান। ১৯৭১-এর আন্দোলন, একটি জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তি লাভের আন্দোলনের বাস্তবায়ন। যার সফলতায় এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি ভূখন্ড, একটি স্বাধীন পতাকা ও একটি স্বাধীন দেশ। তাই, এর মর্যাদা রক্ষায় আমরা অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সদা জাগরুক থাকবো। ইনশাআল্লাহ্!

মহান স্বাধীনতা–অমর, অম্লান ও অক্ষয় হোক।

মুক্তিযুদ্ধ ছিল পরাধীনতার গ্লানি থেকে মানবীয় সত্তার মুক্তি-মানবীয় চিন্তা চেতনাকে ম্লান করে দেয় এমন সব মন্দ থেকে মানব চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা। সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবরূপ দান করতে এ যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দিকনির্দেশনার প্রতি দৃষ্টি দেয়া জরুরী।

মানবজাতির সার্বিক মুক্তিলাভের উপায় নির্দেশ করে তাঁর যুগান্তকারী পুস্তক 'ইসলামী উসুল কী ফিলসফী'-তে তিনি বলেন–

মানুষ তার স্রষ্টার প্রেম ও সন্তুষ্টিতে বিলীন হয়ে যাবে এবং তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব খোদার জন্য হয়ে যাবে। এই সেই মর্যাদা, যা স্মরণ করাতে মুসলমানদের ধর্মের নাম ইসলাম রাখা হয়েছে। কারণ, ইসলামের অর্থ হলো, সম্পূর্ণভাবে খোদার হয়ে যাওয়া এবং নিজের বলতে কিছুই বাকী না রাখা। আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারার ১১৩ নম্বর আয়াতে বলেছেন, মুক্তিপ্রাপ্ত সে-ই, যে তার অস্তিত্বকে খোদার জন্য বিলীন করে দেয় এবং খোদার পথে নিজেকে কুরবানীস্বরূপ রেখে দেয়। শুধু নিয়ত দ্বারাই নয়, বরং সৎকর্ম দ্বারাও তার প্রতিদান খোদার নিকট নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিদের জন্য কোন ভয় নাই এবং তারা শোকার্ত হবে না। আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল্ আনআম-এ হযরত রাসূল করীম (সা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, বল, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই সেই খোদার জন্য, যার রবুবিয়্যত (প্রতিপালনকারী গুণ) সকল বস্তুকেই বেষ্টন করে রয়েছে। কোন বস্তু এবং কোন ব্যক্তি তাঁর অংশীদার নয়। আমার প্রতি আদেশ হয়েছে, আমি যেন তাই করি ইসলামে যথার্থ অর্থে প্রতিষ্ঠিত হই অর্থাৎ খোদার পথে আপন অস্তিত্বকে কুরবানী করতে সকলের অগ্রণী হই (সূরা আন্আম : ১৬৩-১৬৪)। তার পর বলা হয়েছে, এটাই আমার পথ অতএব, এসো আমার পথ অবলম্বন কর। এর বিরোধী কোন পথ অবলম্বন করো না। অন্যথায়, খোদা থেকে দূরে সরে পরবে। (সূরা আন্আম : ১৫৪)। হযরত রাসূল করীম (সা.)কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন, জনগণকে বলে দাও, যদি তোমরা খোদা তাআলাকে ভালবাস, তবে আসো আমার অনুগমন কর এবং আমার পথে চল, যেন খোদাও তোমাদেরকে ভালবাসেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান : ৩২)।

অতএব মহানবী (সা.) এর অনুসরণের মাধ্যমেই মানবজাতি প্রকৃত মুক্তিলাভ করতে পারে।

আল্লাহ্ তাআলা সকলকে মহানবী (সা.) এর অনুপম আদর্শ অনুসরণের তৌফিক দান করুন। আমীন!

সূচীপত্র

৩১ মার্চ ২০১০

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
জুমআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
নেযামে নও (নব বিশ্বব্যবস্থা) হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)	১১
নবীগণের মোহর হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)	১৪
সাফল্যজনকভাবে উদযাপিত হলো মজলিস আনসারুল্লাহ, ঢাকা'র মিলন মেলা ২০১০	১৭
মালী কুরবানী ও ওসিয়্যত ব্যবস্থা জহির উদ্দিন আহমদ	১৮
হযরত ইমাম আবু হানিফা আন্ নো'মান (রহ.) এর কর্মময় জীবনের কয়েকটি দিক মাহমুদ আহমদ সুমন	২১
স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)	২৩
নবীনদের পাতা প্রত্যহ কুরআন করীম পাঠের গুরুত্ব ফারহানা মাহমুদ তন্বী	২৭
মিরপুরের সালানা জলসা ২০১০ জহির আহমদ মিয়াজী	২৮
সংবাদ	৩২

কুরআন শরীফ

সূরা হুদ-১১

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿۹۹﴾ وَاُتْبِعُوْا
فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ
الْمَرْفُوْدُ ﴿۱۰۰﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ
مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ﴿۱۰۱﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ
ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ
رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿۱۰۲﴾

৯৯। কেয়ামত দিবসে সে তার জাতির আগে আগে থাকবে এবং (যেভাবে পশুপালকে পানির ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় সেভাবে) তাদেরকে আগুনের গহ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর কত মন্দ সেই ঘাট এবং কত মন্দ তারা[১৩৪৩-খ] যাদের এতে নিয়ে যাওয়া হবে!

১০০। আর এ (পৃথিবীতে) এবং কিয়ামত দিবসেও অভিশাপ তাদের পিছনে লাগিয়ে দেয়া হলো। এ দান অতি মন্দ (এবং এ দান) যাদের দেয়া হয়েছে তারাও অতি মন্দ[১৩৪৪]!

১০১। এ হলো সেসব (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদের সংবাদগুলোর একটি যার বৃত্তান্ত আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। এদের কোন কোনটি বিদ্যমান রয়েছে এবং কোন কোনটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে।

১০২। আর আমরা তাদের প্রতি কোন অন্যায় করি নি, বরং তারাই নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে[১৩৪৫]। তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ যখন এসে গেলো তখন তাদের সেসব উপাস্য যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ডাকতো এরা তাদের কোন কাজে এলো না। আর এরা তাদের ক্রমাগত ধ্বংসেরই কারণ হলো।

১৩৪৩-খ। 'বেরদুন' উৎপত্তি হয়েছে ওয়াদা হতে যার অর্থ হচ্ছে : সময়, পানি সিঞ্চনের স্থান এবং ঘাট; মানুষ অথবা গরু-মহিষের পাল, জলাধারে আসা বা নামা (আকরাব ও মুফরাদাত)।

১৩৪৪। রেফ্‌দ অর্থ: উপহার বা সমর্থন বা সাহায্য (লেইন)। আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, ফেরাউন, যাকে তার অনুগত লোকেরা আল্লাহ্ তাআলার বিপরীতে সাহায্যকারী মনে করত, সে তাদের জন্য তাদের শেষ দিনে বা পুনরুত্থানের দিনে ক্ষতিকারক সাহায্যকারীরূপে প্রমাণিত হবে, কারণ সে কেবল তাদেরকেই দোযখে নামাবে না বরং সে নিজেও তাদের সঙ্গে তাতে প্রবেশ করবে।

১৩৪৫। কুরআন করীম পুন: পুন: জোর দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন জাতিকে অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করেন না, বরং নিজেদের কুকর্মের দ্বারা আনিত শাস্তিই তারা ভোগ করে থাকে। অদৃষ্টবাদ বা অন্ধ নিয়তির শিকার হওয়ার চিন্তাকে কুরআন অস্বীকার করে। আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃত কারন ছাড়াই খামখেয়ালীভাবে 'জাতিসমূহের উত্থান এবং পতন ঘটিয়ে থাকেন'–এই যুক্তি-দর্শনও কুরআন অস্বীকার করে। এই কারণেই কুরআনের মধ্যে যেখানেই শাস্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সেখানে এটাই ব্যক্ত হয়েছে যে, শাস্তি অথবা পুরস্কার উভয়ই মানুষের নিজের কৃত কর্মফল।

হাদীস শরীফ

দোয়া

কুরআন :

এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন বল আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে (সূরা বাকারা : ১৮৭)।

হাদীস :

হযরত রাসূল করীম (সা.) দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! তোমাকে তোমার পবিত্র মুবারক ও সবচে' প্রিয় নামের দোহাই দিচ্ছি, যখন এ নাম নিয়ে তোমাকে ডাকা হয় তখন তুমি সাড়া দিয়ে থাক। আর যখন এই নামের দোহাই দিয়ে তোমার কাছ থেকে চাওয়া হয় তখন তুমি দান করে থাক। আর যখন এই নামের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে করুণা প্রার্থনা করা হয় তখন তুমি করুণা করে থাক আর যখন এই নামের দোহাই দিয়ে কোন বিপদ দূর হবার জন্যে দোয়া করা হয় তখন তুমি তা কবুল করে থাক (সুনানে ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পথে পরিচালিত করার জন্যে নবীদের প্রেরণ করেছেন। এ সকল নবীদের কাজ একটাই ছিল–স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির অর্থাৎ মানবের সম্পর্ক করে দেয়া। খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবার দৃষ্টান্ত আমরা যুগে যুগে দেখে আসছি। এ সম্পর্ক নিবিড় ও গভীর হবার উত্তম মাধ্যম হলো দোয়া। খোদা তাআলা বলেন, তোমরা যদি আমাকে পেতে চাও তবে ডেকে তো দেখ, আমি সাড়া দেবো। অর্থাৎ দোয়া বা প্রার্থনা করার মাধ্যমে আমরা খোদার জ্যোতিঃ দেখতে পাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো খোদাকে ডাকবো কীভাবে? কীভাবে ডাকলে তার উত্তর পাবো। এ ব্যাপারে হযরত রাসূল করীম (সা.) আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, খোদাকে তাঁর গুনবাচক নাম নিয়ে ডাকো। তাঁর গুণবাচক নাম নিয়ে ডাকার অর্থ হলো সেই গুণাবলী নিজের মধ্যেও সৃষ্টি কর। ইবনে মাজার যে হাদীসটি লেখা হয়েছে আসলে এটা এমন একটা দোয়া যা হৃদয়ের গহীন থেকে নির্গত হলে তা কবুল করা হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার খোদা তাআলা মালিক। এটা তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি দোয়া কবুল করবেন কিনা। তবে আমাদের কাজ তাঁর কাছে চাওয়া। তিনি বড়ই আত্মমর্যাদা অধিকারী। তিনি বলেন, 'আমি আমার এমন বান্দাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে বড়ই লজ্জাবোধ করি, যে আমার সামনে হাত পাতে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের জীবিত খোদা স্মরণ করাতে এসেছেন। তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাতে এসেছেন। তাই আমাদের উচিত আমরা যেন খোদা-তাআলার সমীপে উপস্থিত হই। মিথ্যা খোদাকে পরিহার করে সত্য ও জীবিত খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি। আর এর জন্যে আমাদের দোয়াকারী হতে হবে। খোদাকে ডাকতে হবে। আর এই ডাকার উত্তম পন্থা হলো, খোদার সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেভাবে যে ভাষায় যে কথা উচ্চারণ করে ডেকেছেন আমরাও যেন সেভাবেই তাঁকে ডাকি। আল্লাহ্ করুন এ যুগের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ও অপরাজেয় অস্ত্র দোয়া যেন আমাদের প্রত্যেকের পাথেয় হয়, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

শাফী বা মধ্যস্থকারী হওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন তিনিই, যিনি হবেন কামেল ইনসান অর্থাৎ পূর্ণ মানব। তিনি এই উভয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেই পূর্ণতায় পৌছে যাবেন। এবং এই উভয় প্রকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ণতায় না পৌছা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানব হতে পারবে না। এজন্যই আদমের পরেও আল্লাহ্‌র নিয়ম বা সুন্নতুল্লাহ্ এভাবেই জারী হয়ে এসেছে যে, কামেল ইনসান-যে শাফী হতে পারে-তার জন্য এই উভয় প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ এক সম্পর্ক এই যে, তার মধ্যে আসমানী রূহ ফুৎকার করে দেয়া হয় এবং খোদা তার সঙ্গে এমন ভাবে মিলিত হন যে, মনে হয় যেন তার ওপর অবতীর্ণ হয়েছেন এবং দ্বিতীয় সম্পর্ক হচ্ছে, মানুষের মধ্যকার পরস্পর জোড়া হওয়ার সম্পর্ক, যা হাওয়া এবং আদমের মধ্যে পরস্পর স্বাভাবিক সহানুভূতি ও ভালবাসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, এবং যা তাঁদের মধ্যে সব চাইতে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। এবং এটাই সেই প্রেরণা, যার দরুণ, সব মানুষের প্রতি তাদের স্ত্রীরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এবং এ ব্যাপারে একটা বড় লক্ষণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির প্রেরণা বিদ্যমান থাকে। এবং এদিকে সেই হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যার মধ্যে বলা হয়েছে : **'খায়রকুম খায়রকুম লি আহলিহি'**।

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সে-ই মানবজাতির সর্বাপেক্ষা বেশী কল্যাণ সাধন করতে পারে, যে প্রথমে তার নিজের স্ত্রীর কল্যাণ সাধন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি, তার নিজের স্ত্রীর প্রতি জুলুম ও দুর্ব্যবহার করে, তার পক্ষে এটা সম্ভবই নয় যে, সে অপরের কোন কল্যাণ সাধন করে। কেননা, খোদা আদমকে সৃষ্টি করার পর সর্বপ্রথম তার স্ত্রীকেই তার ভালবাসার পাত্র বানিয়েছেন। সুতরাং, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিংবা যার কোন স্ত্রীই নেই, সে কামেল ইনসান হওয়ার স্তর থেকে নীচে পড়ে গেছে। এবং সে শাফায়াতের দুই শর্তের একটি থেকে বঞ্চিত। এজন্য, যদি সে নিস্পাপও হয়, তবু সে শাফায়াত করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কিন্তু, যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে, সে নিজের জন্য মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির বুনিয়াদ স্থাপন করে। কেননা, একজন স্ত্রীই বহুজনের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনের কারণ হয়ে যায়। এবং সন্তান জন্মদান করে। তাদেরও বিয়ে শাদী হয়। ছেলে মেয়েদের নানী, মামা ইত্যাদি নানা রকমের সম্বন্ধ হয়। এবং এভাবেই এক ব্যক্তি বহুজনের সঙ্গে ভালবাসা ও সহানুভূতি-সহমর্মিতায় জড়িত হয়ে পড়ে। এবং ভালবাসা ও সহানুভূতিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। এবং তার এই অভ্যাসের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সকলকেই আপন সহানুভূতির অংশ দিতে থাকে। কিন্তু যে সকল লোক রোগীদের ন্যায় লালিত পালিত হয় বা জীবন যাপন করে তারা এই অভ্যাসকে বৃদ্ধি করার কোনও মওকাই পায় না। ফলে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায়, এবং শুষ্ক হয়ে যায়।

[প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর রচনাবলী থেকে সংকলিত উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ রাসূলে আজম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জ্যোতির্ময় গৌরব ও মহিমা পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠা থেকে]

জুমুআর খুতবা

'আল্লাহ্ তাআলার 'ওলী' বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা'

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১৩ নভেম্বর, ২০০৯-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত ক'টি তিলাওয়াত করেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

এ আয়াতসমূহের অনুবাদ হল, জেনে রাখ! যারা আল্লাহ্র বন্ধু তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্থও হবে না। যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং পরকালেও। আল্লাহ্র বাণীতে কোন প্রকার পরিবর্তন নেই। এটি-ই মহান সফলতা। (সূরা ইউনুস:৬৩-৬৫)

এ আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তাআলা এখানে 'আওলিয়া আল্লাহ'-এর অবস্থা ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ তারা ভয়ে ভীত হয় না; দ্বিতীয়তঃ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ অর্থাৎ তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয় না এবং পরবর্তী আয়াতে বলেছেন, آمَنُوا অর্থাৎ ঈমান আনয়নকারী এবং এর (ঈমানের) পূর্ণতা অর্জনকারী; এরপর يَتَّقُونَ অর্থাৎ, তাকওয়া অবলম্বনকারী এবং যারা আল্লাহ্ তাআলার ওলী হয় আল্লাহ্ তাআলাও তাদের ওলী (অভিভাবক) হয়ে যান। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে সুসংবাদ রয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওলী, বন্ধু ও প্রকৃত মুমিনদেরকে যা দান করে থাকেন তা একটি নিয়ামত বা পুরস্কারের অব্যাহত ধারা। আল্লাহ্ তাআলার সাথে সুসম্পর্কের কারণে, তার সাথে আল্লাহ্ তাআলার চলমান আচরণের কারণে একজন প্রকৃত মুমিনের হৃদয়ে এ প্রশান্তি থাকে যে, কোন প্রকার বিপদাপদ ও পরীক্ষার জন্য তাকে কোন বাস্তবিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না। ভয়-ভীতির আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে, পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দিনাতিপাত করতে হতে পারে কিন্তু এরপরও একজন প্রকৃত মুমিনের হৃদয়ে এ প্রশান্তি থাকে যে, এ পৃথিবীতে কোন প্রকার পার্থিব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলেও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজ কল্যাণে তা পূর্ণ করে দিবেন এবং কোন ধরণের প্রাণের ক্ষতি হলেও পরকালে তাঁর অঙ্গীকার অনুযায়ী পুরস্কারে ভূষিত করবেন আর তা এমন পুরস্কার যা কল্পনাতীত। কিন্তু এর জন্য আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম যে শর্তটি আরোপ করেছেন তা হল, আল্লাহ্ তাআলার বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। পার্থিব বন্ধুত্বের জন্য তো অনেক সময় আমরা অনেক বড় বড় কুরবানী করে থাকি। আল্লাহ্ তাআলার বন্ধু বলে আখ্যায়িত হওয়া এবং বন্ধু হওয়ার জন্যও তাঁর (বন্ধুত্বের মর্যাদা) পরিপূর্ণরূপে রক্ষা করতে সর্বদা শুধু প্রস্তুতই থাকতে হবে না বরং এক ভালবাসার আবেগে আপ্লুত হয়ে তাঁর প্রতিটি আদেশের ওপর লাব্বাইক (আমি উপস্থিত) বলে কর্মরত হতে হবে। যখন এমনটি হবে তখন আল্লাহ্ তাআলার ওলীরা ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলার ভয় অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার বন্ধুত্ব যেন হারাতে না হয়, এ ভয়- তাঁর ওলীদেরকে সব ধরণের পার্থিব ভয়-ভীতি হতে রক্ষা করবে। ইমাম রাগেব লিখেন, الخوف لله অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করার অর্থ গুণা হতে বেঁচে চলা ও আনুগত্য করা এবং পরিপূর্ণরূপে দাসত্ব ও ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হওয়া। কাজেই, (এটি জেনে রাখতে হবে) 'আওলিয়া আল্লাহ'-এর মর্যাদা এমনি এমনি পাওয়া যায় না।

একস্থানে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

অর্থাৎ পার্শ্বদেশ বিছানা হতে পৃথক হয়ে যায় (অর্থাৎ রাতে নফল নামায পড়ার জন্য তারা তাদের বিছানা ত্যাগ করে) এবং তারা একদিকে আল্লাহ্ তাআলার ভয় এবং অপরদিকে আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাশা রেখে প্রার্থনা করে ও তিনি তাদেরকে যা কিছু দান করেছেন সেখান থেকে তারা খরচ করে। (সূরা আস্ সাজদা:১৭)

কাজেই, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আওলীয়াদের ভয় দূর করে দিয়ে থাকেন, এর কারণ তারা কেবল আল্লাহ্ তাআলাকেই ভয় করে। পার্থিব ভয়-ভীতি তাদের নিকট এক পয়সারও মূল্য রাখে না। পৃথিবী নয় বরং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি তাদের উদ্দেশ্য হওয়ার জন্য তারা ভবিষ্যতের কোন বিষয়কে ভয় করবে না। শুধু এতোটুকুই নয় বরং এ কথা

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ অর্থাৎ তারা বিগত কোন বিষয়ের জন্যও চিন্তাগ্রস্থ হবে না বলার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আরো বেশি সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। মোটকথা, আল্লাহ্ তাআলা যখন কাউকে তার ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে নিজের বন্ধু বানিয়ে নেন তখন তিনি তাকে তার বিগত ভুল-ভ্রান্তির প্রভাব ও কষ্ট হতেও নিরাপদ রাখেন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই এমন সত্তা, যিনি একবার কাউকে বন্ধু বানিয়ে নেয়ার পর বান্দা তাঁর বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে থাকলে আল্লাহ্ তাআলা যেখানে ভবিষ্যত কল্যাণের নিশ্চয়তা দান করেন সেখানে বিগত পাপ-পঙ্কিলতার বোঝা হতেও মুক্তি দেয়ার নিশ্চয়তা দান করেন। পৃথিবীর কোন শক্তি এমন মহান নিশ্চয়তা দেয়ার অধিকার রাখে না বরং ক্ষমতাও রাখে না। সুতরাং কতই না সুন্দর আমাদের আল্লাহ্! যিনি সব ক্ষমতার আধার এবং মানুষ তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সব ধরণের ভয়-ভীতি ও যাতনা হতে মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়! পৃথিবীর এক বড় অংশ খোদা তাআলার দ্বার ছেড়ে অন্যের দ্বারস্থ হয়ে পরে রয়েছে। শুধু মাত্র খোদা তাআলার দ্বার ছেড়ে দিয়েই ক্ষান্ত নয় বরং বিদ্রোহেও অগ্রগামী হয়ে গেছে। খোদা তাআলার বিরুদ্ধে পুস্তক লিপিবদ্ধ করা হয়। আল্লাহ্ তাআলার সত্তা সম্পর্কে সন্দেহে নিপতিত হয়ে যায়, খোদা তাআলা আছে কি না? খোদা তাআলার যে কোন ধরনের হক আদায় করার এবং তাঁর ইবাদত গুযার হওয়ার দিকে মনোযোগী হওয়া সম্পর্কে পৃথিবীর এক বড় অংশ চিন্তাও করতে চায় না। এর পরিনামে মানুষ জাহান্নামের দিকে দ্রুততার সাথে ধাবিত হচ্ছে। সুতরাং বড়ই ভয়ের বিষয়, অনেক বেশি মনোযোগ দেয়া এবং ইস্তেগফার করা প্রয়োজন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, খোদা তাআলা তাকে ওলী বলেছেন। অথচ তিনি অমুখাপেক্ষী, কারও প্রয়োজন তাঁর নাই, আল্লাহ তাআলা বন্ধুর কথা বলেছেন, অথচ তাঁর তো কোন বন্ধুর প্রয়োজন নাই। এজন্য ব্যাতিক্রম এই শর্তের সাথে ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু ওলীউম মিনাদ্‌দুল। এটা একেবারেই সত্য কথা খোদা তাআলাকে ছেড়ে দেয়া কাউকে খোদা তাঁর বন্ধু বানায় না বরং শুধুমাত্র তাঁর ফযল এবং দয়াই কাউকে তার নৈকট্য দানকরে। কাউকে তাঁর কোন প্রয়োজন নাই। এই ওহী ইলহাম লাভের যোগ্যতা এবং নৈকট্যের উপকারও সে-ই প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মানুষের নিকট পৌছায়। স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তাআলার মনোনয়ন এবং বেছে নেয়া প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ থেকে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন, নির্বাচন করেন, সাধুতা দান করেন। তখন এটা মানুষের অভ্যন্তরে খোদা তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যে আকর্ষণ সেটা তাকে দেখে করে থাকে। তিনি বলেন যে, সম্ভব অতীতের জীবনে সে কোন ছোট অথবা বড় গুনাহ করেছে। একজন মানুষ তার প্রাথমিক জীবনে ছোট এবং বড় গুনাহ করে থাকে। কিন্তু যখন তার আল্লাহ্ তাআলার সাথে সত্য সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় তখন তিনি সব ধরনের গুনাহ মাফ করে দেন। এক গুনাহগার ব্যক্তিও, যে তার প্রাথমিক জীবনে অনেক বড় বড় গুনাহও করেছে আবার ছোট গুনাহ্ও করেছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন খোদা তাআলার সাথে তার সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় তার প্রথম গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং কখনোই তাকে লজ্জায় ফেলেন না। না এ দুনিয়াতে না পরকালে। এটা আল্লাহ্ তাআলার কিরূপ অনুগ্রহ, যখন তিনি একবার ক্ষমা করেন এবং উপেক্ষা করেন তখন আর সেটাকে কখনোই স্মরণ করেন না। এটাকে ঢেকে রাখেন। কিন্তু তাঁর এরূপ অনুগ্রহ ও দয়া সত্ত্বেও যদি সে অর্থাৎ মানুষ কপটতার জীবন অবলম্বন করে তাহলে এটা তার জন্য কঠিন দুর্ভাগ্যের কারণ হয়।

তিনি (আ.) বলেন, বরকত এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের জন্য মনের পরিচ্ছন্নতাও অনেক জরুরী। যতক্ষন হৃদয় পরিস্কার হবে না ততক্ষন কিছুই হবে না। উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা যখন কারো প্রতি দৃষ্টি দেন তখন কারো মাঝে কপটতার লেশমাত্রও যেন না থাকে। যখন এই অবস্থা হবে তখনই ঐশী ব্যবস্থাপনার বিকাশ ঘটবে। মানুষের হৃদয়ে, জীবনে কোন ধরনের কপটতা থাকা ঠিক না। বিষয়াদি পরিস্কার থাকা দরকার। এর জন্য এমন বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী হওয়া উচিত, যেভাবে ইব্রাহিম (আ.) নিজের নমুনা প্রদর্শন করেছেন অথবা মহানবী (সা.) যেভাবে নমুনা প্রদর্শন করেছেন। যখন মানুষ এই দৃষ্টান্তের ওপর পা রাখে তখন সে বরকতের অধিকারী হয়ে যায়। তখন সে পৃথিবীতে কোন প্রকারে লাঞ্ছিত হয় না এবং রিযিকের সংকীর্ণতার কষ্ট সে ভোগ করে না বরং তাতে খোদা তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের দরজা খুলে যায় এবং আহ্বানের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়ে যায়। খোদা তাআলা তাকে লাঞ্ছিত জীবন দিয়ে ধ্বংস করেন না। বরং তাকে উত্তম পরিনামের দিকে নিয়ে যান। এর সারসংক্ষেপ হল, যে ব্যাক্তি খোদা তাআলার সাথে সত্য এবং পূর্ণ সম্পর্ক রাখে তখন খোদা তাআলা তার সকল আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করে দেন। তাকে নিরাশ করেন না।

তারপর এ আয়াতগুলির মধ্যে দ্বিতীয় আয়াতে খোদা তাআলা বলেন, 'আল্লাযিনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন' অর্থাৎ সে সব লোক যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়ার ওপর চলে এসব ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বন্ধু হয়। এটি আল্লাহ্ তাআলার ওলীর ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে তারা ঈমানে বৃদ্ধি পেতে

থাকে এবং তাকওয়ার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠাকারী হয়। এক হাদীসে এসেছে মহানবী (সা.) বলেন, যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন আল্লাহ্ তাআলার ওলীদেরকে নিয়ে আসা হবে। তাদেরকে খোদার সামনে উপস্থিত করা হবে। তাদের তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে, আওলিয়াদের শ্রেণী নিম্নে। প্রথমে এক শ্রেণীর লোককে নিয়ে আসা হবে। এই গ্রুপের মধ্যে থেকে একজন প্রতিনিধিকে ডেকে আল্লাহ্ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, হে আমার বান্দা! তুমি সৎকর্ম কি কারণে করেছ? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যা কিছু আপনার আনুগত্যকারীদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে থেকে জান্নাতও সৃষ্টি করেছেন এবং তার গাছ ও ফল তৈরি করেছেন, ঝর্ণাসমূহ সৃষ্টি করেছেন, এর হুর এবং পুরস্কারসমূহ তৈরি করেছেন। কাজেই আমি এসব কিছু পাওয়ার জন্য রাতে উঠে জাগ্রত থেকে নফল আদায় করেছি এবং দিনের বেলা রোযা রেখেছি। এতে খোদা তাআলা বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি শুধু জান্নাতের জন্য কর্ম করেছ। সুতরাং এই হল জান্নাত, এতে প্রবেশ কর আর এটাই আমার দয়া, আমি তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলাম। আর এটাও আমার দয়া, আমি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। সুতরাং সে এবং তার সাথী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এরপর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকে একজনকে নেয়া হবে। তাকে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন- হে আমার বান্দা! তুমি কেন পুণ্য কর্ম করেছ? সে উত্তর দিবে- হে আমার প্রভু ! তুমি জাহান্নাম সৃষ্টি করেছ। এর বেড়িসমূহ, উত্তপ্ত লেলিহান অগ্নি শিখা, এর উত্তপ্ত বাতাস, ফুটন্ত পানি, যা কিছু তুমি তোমার অবাধ্যদের ও শত্রুদের জন্য সৃষ্টি করেছ, আমি এগুলোকে ভয় করে রাত্রে উঠে নফল পড়েছি আর দিনে রোযা রেখেছি। এতে খোদা তাআলা বলবেন– হে আমার বান্দা! তুমি এ কাজ আমার আগুনের ভয়ে করেছ। সুতরাং আমি তোমাকে আগুন থেকে মুক্তি দিলাম। আমার দয়ায় তোমাকে আমার জান্নাতে প্রবেশ করাবো। সুতরাং সে তার সঙ্গীসাথীসহ জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আমি নবী করীম (সা.) কে এটা বলতে শুনেছি, বান্দা ততক্ষন পর্যন্ত সেই খাঁটি ঈমানের অধিকারী হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত সে কেবল আল্লাহর জন্য কারো প্রতি বৈরীতা পোষণ করে এবং কারো সাথে ভালবাসাও আল্লাহর জন্য করে। যতক্ষন সে আল্লাহ তাআলার জন্য কারো প্রতি ভালবাসা রাখে এবং আল্লাহ তাআলার জন্যই কারো সাথে বৈরীতা রাখে, তখন সে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব রাখার যোগ্য হয়ে যায়।

এরপর তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে থেকে একজনকে নেয়া হবে। তাকে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন- হে আমার বান্দা! তুমি পুণ্য কর্ম কি কারণে করেছো? সে বলবে- হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তোমার ভালবাসার নিমিত্তে। আমি শুধুমাত্র তোমার ভালবাসা ও সাক্ষাতের বড়ই আকাঙ্খী। তোমার সাক্ষাতের জন্য আমি রাতে জেগেছি, দিনে রোযা রেখেছি। আমি শুধুমাত্র তোমার সাক্ষাৎ লাভ ও তোমার ভালবাসার নিমিত্তেই করেছি। সুতরাং অত্যন্ত বরকতময় ও মর্যাদাবান খোদা তাআলা তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি সব কাজ আমার ভালবাসা ও সাক্ষাতের আকাঙ্খায় করেছ সুতরাং নিজের প্রতিদান নাও। আল্লাহ্ জাল্লা শানহু তার জন্য নিজ প্রতাপের জ্যোতির বিকাশ ঘটাবেন, সব পর্দাকে নিজের চেহারা থেকে সরিয়ে দিবেন এবং তার সামনে এসে যাবেন। আল্লাহ্ বলবেন- হে আমার বান্দা! এই আমি উপস্থিত আছি। আমার দিকে তাকাও। পরে বলবেন- আমি আমার দয়ায় তোমাকে আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং জান্নাত তোমার জন্য বৈধ করে দিচ্ছি। ফিরিশতাদেরকে তোমার নিকট পাঠাবো এবং আমি স্বয়ং তোমাকে সালাম বলবো। সুতরাং সে তার সঙ্গী-সাথীসহ জান্নাতে প্রবেশ করবে। এখন এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেকে নিজেদের মনমত করে কর্ম করেছে এবং এ তিন শ্রেণীকে আল্লাহ্ তাআলা নিজের ওলীদের (বন্ধুর) অর্ন্তভুক্ত বলে গণ্য করে নিয়েছেন।

এই বিশদ হাদীস তফসীর ইবনে কাসীরের। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এটা তফসীরে কবীরে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসে আওলিয়াদের বিভিন্ন শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ জান্নাতের আকাংঙ্খা পোষণকারী ও জান্নাত লাভের জন্য কর্ম সম্পাদনকারী। দ্বিতীয়তঃ জাহান্নামের ভয়ে ভীত হয়ে পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারী। তৃতীয়তঃ খোদা তাআলার ভালবাসায় নিজেকে বিলীন করে। এই তিন গ্রুপকেই আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলছেন- এটা তোমাদের কর্মের

ফলশ্রুতিতে নয় বরং আমি নিজের দয়ার কারণে তোমাদেরকে এ সুসংবাদ দিচ্ছি। প্রত্যেক শ্রেণীর মাঝে এক এক ব্যক্তি সামনে আসছে এবং আল্লাহ্ তাআলার আশিস ও কল্যাণ লাভ করে নিজের সঙ্গী-সাথীসহ জান্নাতে প্রবেশ করছে। শেষ শ্রেণী, যারা খোদা তাআলার ভালবাসায় বিলীন, নিশ্চিত বলা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই তাদের নেতা হবেন।

হাদীসে আছে, মহানবী (সা.)এর মৃত্যুর সময় উচ্চারিত শব্দ রাফিকুল আলা! রাফিকুল আলা! এটারই প্রমাণ বহন করে যে, তিনি (সা.) শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা লাভেরই প্রত্যাশী ছিলেন। এই কারণেই তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং আওলীয়াদেরও বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। কিন্তু মৌলিক বিষয়, ঈমান ও তাকওয়াতে উন্নতি লাভ করা। নবীগণ আল্লাহ্ তাআলার ঐ আওলিয়া (বন্ধু) যাদের ঈমান আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং তারা তাকওয়ার উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। আমি যেভাবে বলেছি- এ সর্বোত্তম উদাহরণ মহানবী (সা.) এর সত্তা। আওলীয়া কেরামের বিষয়ে হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। কারা আল্লাহ তাআলার ওলী হবার সবচেয়ে যোগ্য হন এবং কিভাবে এ পদমর্যাদা অর্জন করা যায়। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে এক হাদীস রয়েছে।

হযরত আমর বিন আস (রা.) বর্ণনা করেন- **আমি নবী করীম (সা.) কে এটা বলতে শুনেছি, বান্দা ততক্ষন পর্যন্ত সেই খাঁটি ঈমানের অধিকারী হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত সে কেবল আল্লাহর জন্য কারো প্রতি বৈরীতা পোষণ করে এবং কারো সাথে ভালবাসাও আল্লাহর জন্য করে। যতক্ষন সে আল্লাহ তাআলার জন্য কারো প্রতি ভালবাসা রাখে এবং আল্লাহ তাআলার জন্যই কারো সাথে বৈরীতা রাখে, তখন সে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব রাখার যোগ্য হয়ে যায়।** তিনি বলেছেন, আমার বান্দাদের মাঝে আমার আওলীয়া (বন্ধু) এবং সৃষ্টির মাঝে আমার প্রেমাস্পদ তারা যারা আমাকে স্মরণ রাখে আর আমিও তাদের স্মরণ রাখি। সুতরাং এ হাদীসে পরিশুদ্ধ ঈমানের এ চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে- বান্দার প্রত্যেক কর্ম এমন কি পারস্পরিক ভালবাসা ও ঘৃণা যাই হোক এটাও খোদা তাআলার ভালবাসা ও সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে হয় না। যদি মানুষ নিজের হিসাব নেয় তবে ভয়ে ভীত বিহ্বল হয়ে যাবে। একদিকে তো দাবী করে আমরা খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী। অন্যদিকে অনেক এমন লোক রয়েছে যাদের হৃদয় ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও ব্যক্তিগত শত্রুতায় পূর্ণ। কারো ভুল দেখলে ক্ষমা করতে চায় না। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কারণে যখন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে যায় তখন তারা আল্লাহ্ তাআলার বন্ধু হয়ে যায়।

আরেকটি হাদীস রয়েছে। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন- নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন এবং তিনটি বিষয়কে অপছন্দ করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন- তোমরা তাঁর ইবাদত কর, কোন জিনিসকে তাঁর সাথে শরীক না বানাও এবং যাকে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন তার শুভাকাঙ্খী হও। তোমরা সবাই আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে আকড়ে ধর, দলাদলি করো না।

তিনি তোমাদের বৃথা বাক্য ব্যয়, অধিক চাওয়া এবং সম্পদ অপব্যয় করা অপছন্দ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। এর মধ্যে ফরয (আবশ্যিক) ও নফল (ঐচ্ছিক) উভয়ই ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়ে যে অমোনোযোগী ও উদাসীন হবে, আল্লাহ্ তাআলা তার তত্ত্বাবধায়ক তো হবেনই না, সে মুমিন বলেও গণ্য হবে না। এটি হল ঈমানের পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে তাঁর পছন্দনীয় বিষয়াবলীর মধ্য থেকে তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন তা হল, তোমাদের ওপর যাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়, তার হিতাকাঙ্খী ও মঙ্গলকামী হও। নিযামে জামাতের পক্ষ থেকে কাকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় ?

নিযামে জামাতের পক্ষ থেকে যাদেরকে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়, তারা সত্যিকার মুমিনদের তত্ত্বাবধায়ক। সে একজন প্রকৃত মুমিন যে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় ও তাঁর প্রকৃত বন্ধু হতে চায়। তার দায়িত্ব তাদেরকে সর্বাত্মক সাহায্য করা ও তাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্খী হওয়া। যেখানে এ বিষয়টির প্রতি সাধারণ মুমিনদের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে এবং সব ধরনের বিশৃঙ্খলা থেকে বেঁচে চলার প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করা হয়েছে সেখানে কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্তদেরও চিন্তা করা উচিত। তাদের ভয় করা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমার মঙ্গল কামনা করছে, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদেরও তার কাঙ্খিত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সূচারু রূপে পালন করা আবশ্যক। শুধু একপক্ষ একতরফাভাবে হিতাকাঙ্খী হবে, এটা সমীচিন নয়। বরং যখন ন্যায় বিচারের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত হবে, নিয়্যত পরিষ্কার হবে এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তারা কাজ করবে তখন অধিনস্থরাও তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তাআলার ভয় রেখে তাদের হিতাকাঙ্খী হবে। তাদের প্রতি কুধারণা পোষণ করার বিষয়টি দূর হবে এবং প্রেমময় অবস্থা

সৃষ্টি হবে। অত:পর বলেছেন, আল্লাহর রজ্জু দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে থাক এবং পরস্পর দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যেও না। এখানে পুনরায় সব মুমিনদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, যদি দায়িত্ব প্রাপ্তদের কোন নির্দেশ তোমাদের অসন্তোষজনকও হয় তখন তোমাদের এমন কোন ভুল পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ নয় যা কোন প্রকার অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়। দায়িত্ব প্রাপ্তদেরও আদেশ করা হচ্ছে, তোমাদের প্রতিক্রিয়া ও আচরণ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে খোদা তাআলার প্রতি ভয় প্রকাশ পায়। পুণ্যকাজ করা ও তাকওয়া অবলম্বনের জন্যই আল্লাহ্ তাআলার রজ্জু বানানো হয়েছে। এতে নিজ স্বার্থ বা মন্দ কাজের কারণে যেন তোমাদের কোন দুর্বলতা প্রকাশ না পায়। যার ফলে এ রশি ছিড়ে যাওয়ার বা কোন ব্যক্তির হাত ফসকে অগ্নি গহ্বরে পতিত হবার ভয় থাকে। আল্লাহ্ তাআলার বন্ধু তো তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তার সাথীদের বাঁচানোর জন্য তাদের হাত আঁকড়ে ধরে।

অত:পর বলেছেন, অপছন্দনীয় কার্যাবলী থেকে নিজেকে বিরত রাখ। কেননা এ সব কাজ মানুষকে খোদা তাআলা থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। বাচালতা, বেহুদা ও নিরর্থক কথাবার্তা, পরস্পর মতবিরোধ, এসব বিষয় যখন আরম্ভ হয় তখন আল্লাহ্ তাআলার রশিতে আঁকড়ে ধরা হাতের বাঁধন ঢিলা হতে থাকে। অতঃপর অধিক চাওয়া ও সম্পদ অপব্যয় করতে নিষেধ করেছেন। একজন মুমিনের মধ্যে স্বল্পেতুষ্টির বিষয় ও ধর্মের পথে সম্পদ খরচের প্রতি আকর্ষন থাকা উচিত। অতঃপর এক হাদীসে আল্লাহ্ তাআলার বান্দাদের মর্যাদার একটি চমকপ্রদ চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ননা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলার এমন কতিপয় বান্দা রয়েছে যারা নবীও নয়, শহীদও নয় এরপরও কিয়ামতের দিন নবী ও শহীদগণ আল্লাহ্ তাআলার নিকট তাদের মর্যাদার কারণে তাদের বিষয়ে গর্ব করবেন। (এ কথা শুনে) সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদেরকে অবগত করবেন এরা কারা, মহানবী (সা.) বললেন, শুধু আল্লাহ্ তাআলার রহমতের কারণে যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে, আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে নয় আর না এমন সম্পদের কারণে যা তারা একে অপরকে দিয়ে থাকে।

আল্লাহর কসম, তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং অবশ্যই তারা জ্যোতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। লোকেরা যখন ভয় অনুভব করবে তখন তাদের কোন ভয় থাকবে না, যখন লোকেরা দুশ্চিন্তায় দিশাহারা হবে তখন তাদের কোন চিন্তা থাকবে না। অতঃপর মহানবী (সা.) এ আয়াত পাঠ করেন, "আলা ইন্না আউলিয়াল্লাহে লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহযানুন" সুতরাং তারা আল্লাহর ওলী হয়ে থাকেন, যাদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে। খোদা তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তারা যখন সব ধরনের পুণ্যকাজ সম্পাদন করে তখন নিশ্চয় এমন লোকদের জন্য নবীগণ গর্ব করেন, এর কারণ আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের আনুগত্যকারীদের মধ্যে এমন লোকও দান করেছেন যারা নেকীর মানদন্ডের চূড়ায় পৌঁছেছেন। নবীদের আগমনের উদ্দেশ্যই তো আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধন করা। সুতরাং যখন তাদের অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে বিপ্লব সাধন করে তখন নিশ্চয় নবীদের জন্য এটি গর্ব করার মতই বিষয়। কেননা নবীগণ স্বয়ং নেকীর মানদন্ডের চূড়ায় পৌছে আল্লাহর ওলী হওয়ার উচ্চ মর্যাদা লাভ করে থাকেন। তাঁরা তাদের পুণ্যকাজের জন্য গর্ব অনুভব করেন না বরং তারা এজন্য আনন্দিত হন যে, তাঁদের মান্যকারীরাও পুণ্যের চরম শিখরে পৌছেছে, আমাকে মান্যকারীরা মর্যাদা অর্জনের চেষ্টা করছে।

ইতিপূর্বে আমি যে হাদীসটি পড়েছি সেখানেও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, **নবীগণ আওলিয়ার উচ্চ মর্যাদা লাভ করে থাকেন এবং এর মাঝে হযরত রাসূল করীম (সা.) এর মর্যাদা সবার শীর্ষে। সুতরাং রাসূল করীম (সা.) এর প্রেরিত হবার পর এ যুগে আল্লাহ তাআলার বন্ধু তিনিই যিনি রাসূল করীম (সা.) এর উম্মতের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হয়ে প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পাদন করে থাকেন।** এ কারণেই এ সব মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য লাভ করে। তাদের প্রত্যেকের ভয়-ভীতি এবং দুশ্চিন্তাকে আল্লাহ্ তাআলা দূর করে দেন। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্খা থাকলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সব নির্দেশাবলীর ওপরও দৃষ্টি থাকবে। এটিও একজন প্রকৃত মুমিনের কাজ।

শেষ যুগে মসীহ মাওউদ (আ.) কে মান্য করাও খোদা তাআলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের মাঝে একটি নির্দেশ। যেভাবে হাদিসে উল্লেখ আছে দ্বিধাবিভক্ত হয়োনা, আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধর। এ সব কথা এ দিকে ইশারা করে যে, কেউ একজন এ দলাদলির অবশান ঘটাবে। এ কাজ সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবে না যাকে স্বয়ং খোদা তাআলা প্রেরণ করেছেন। যে আল্লাহর বন্ধু হবার উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে। সুতরাং শেষ যুগে আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ভালবাসার জামাত সৃষ্টি করা এবং এক হাতে একত্রিত হয়ে সব ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তার মাঝে আসার এ অনন্য বৈশিষ্ট্য কেবল মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামাতেরই রয়েছে। এমনটি হওয়াই

অবধারিত। এটা যেমন অ-আহমদীদের চিন্তার বিষয় তেমনই আহমদীদেরকেও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।

আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, জামাতের ব্যবস্থাপনাকে সম্মান করা, আনুগত্য এবং খেলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি করা অতীব জরুরী। অপর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এমন লোকদের জন্য সুসংবাদ আছে। তার জন্য কেবল ইহকালেই পুরস্কার নয় বরং পরকালেও তার জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করা আছে। নিশ্চয়ই একজন মুমিনের জন্য এ পুরস্কার লাভ করা তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করার সমতুল্য এবং এক মহাবিজয় স্বরূপ। এ সুসংবাদ কিভাবে পাওয়া যায় এবং এর অর্থই বা কি? এ ব্যাপারেও হাদিসে উল্লেখ পাওয়া যায়। এক হাদীসে রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, লাহুমুল বুসরা ফিল হায়াতিদ দুন্‌য়া ওয়া ফিল আখিরাহ্ এখানে বুশরাহ দ্বারা (রো'য়ায়ে সালেহা) সত্য স্বপ্ন বোঝানো হয়েছে। মুমিন নিজের ব্যাপারে নিজেই (সত্য স্বপ্ন) দেখে থাকে অথবা তার ব্যাপারে অন্য কেউ দেখে।

এভাবে একটি বর্ণনায় আছে, যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, পরকালের সুসংবাদ হল স্বর্গ, এ জগতের সুসংবাদ কি? মহানবী (সা.) বলেন, সত্য স্বপ্ন যা বান্দা দেখে থাকে, অথবা তার ব্যাপারে অন্যদেরকে দেখানো হয়। এ সব সত্য স্বপ্নে পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করা হয়ে থাকে। সুতরাং এ স্বপ্ন উদ্দেশ্যহীন ভাবে দেখানো হয়না। কখনো ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করার ব্যাপারে হয়ে থাকে, এরপর আল্লাহ্ তাআলা তা পূর্ণ করেন। মুমিনদের জীবন যে ভীতিপ্রদ অবস্থায় থাকে তা নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেন। কখনো পুরস্কৃত করার ব্যাপারে হয়ে থাকে এবং একজন মু'মিন প্রত্যেক মুহূর্তে তার জীবনে তা দেখে। জামাতী জীবনে যে কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা নিয়ামতের বারি বর্ষণ করেন এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা কয়েকজন মুমিনকে বলে দেন যে এভাবে হবে, আর তা হয়।

নবীগণ আওলিয়ার উচ্চ মর্যাদা লাভ করে থাকেন এবং এর মাঝে হযরত রাসূল করীম (সা.) এর মর্যাদা সবার শীর্ষে। সুতরাং রাসূল করীম (সা.) এর প্রেরিত হবার পর এ যুগে আল্লাহ তাআলার বন্ধু তিনিই যিনি রাসূল করীম (সা.) এর উম্মতের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হয়ে প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পাদন করে থাকেন।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা সুসংবাদের স্বপ্ন দেখিয়ে এ পুরস্কারসমূহের খবর দিয়ে দেন। এ ছাড়া অনেক ধরণের সুসংবাদপূর্ণ স্বপ্ন আছে, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় আল্লাহ্ তাআলা নিজ ফযলে ভূষিত করছেন এবং তাঁর সাহায্য মু'মিনদের সাথে আছে। সুতরাং মুমিনদের জামাতের সকল কর্মকান্ড যখন আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যে হয়, যখন তারা এক জামাতভূক্ত হয়ে যায় এবং খোদা তাআলার বন্ধু হবার চেষ্টা করে তখন খোদা তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের এ পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে তারা সুসংবাদ পায়। এ সম্পর্কের কারণে আজ আমাদের এ ভালবাসা জামাত ও খিলাফতের দৃঢ়তা এবং খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বলে দৃষ্টিগোচর হয়।

আল্লাহ তাআলা ঈমানে দৃঢ়তার উদ্দেশ্যে মুমিনদেরকে (রো'য়ায়ে সালেহা) সত্যস্বপ্ন দেখান। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত এ দৃঢ় সম্পর্ক আরো বলিষ্ঠ হতে থাকবে এবং প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন (মানুষ) আল্লাহ্ তাআলার সুসংবাদ থেকে অংশ লাভ করতে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলার সুসংবাদসমূহ একজন মুমিনের জন্য মহান সফলতার ঘোষণা দিতে থাকবে, যেন ঈমানে উন্নতি হতে থাকে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, 'ঈমানদার লোক জাগতিক জীবনে এবং পরকালেও সুসংবাদের নিদর্শন পেতে থাকবে। যার মাধ্যমে তারা ইহকালে এবং পরকালে তত্ত্বজ্ঞান এবং ভালবাসার ময়দানে সীমাহীন উন্নতি করতে থাকবে। এটি খোদার কথা, যা কখনো বৃথা যাবে না।

সুসংবাদের দৃশ্য লাভ করাই মহাবিজয় অর্থাৎ এটিই এমন এক বিষয় যা ভালবাসায় এবং তত্ত্বজ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন এ সূক্ষ্ম বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হই এবং নিজেদের ঈমান এবং তাকওয়াকে সেই মর্যাদায় উন্নীত করি যেখানে খোদা তাআলার তত্ত্বজ্ঞান এবং ভালবাসায় আরো অগ্রসর হওয়া যায়। আমরা যেন তাঁর সন্তুষ্টির স্বর্গ অর্জন করতে সক্ষম হই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সব ভয়-ভীতিকে নিরপত্তায় পরিবর্তন করে দিন এবং আমাদের গুনাহ ও ভুল-ভ্রান্তিকে নিজ রহমতের চাঁদরে ঢেকে দিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তাকে দূর করে দিন। (আমীন)

[জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত]

নেযামে নও

(নব বিশ্বব্যবস্থা)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাযিআল্লাহু আনহু
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা

(শেষ কিস্তি)

ওসীয়্যত এর মাধ্যমে প্রবর্তিত ব্যবস্থা নিশ্চিতই প্রতিষ্ঠা পাবে

কতিপয় লোক এটাও বলে বসে যে, এই ব্যবস্থা না জানি কবে প্রতিষ্ঠিত হবে? জামা'তের উন্নতি তো খুবই ধীর গতিতে হচ্ছে। এর উত্তর হলো 'বালুচরে কখনও ঘর বাঁধা যায় না'। ভিত্তিহীন জামাত অতি দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে। তড়ি-ঘড়ি করে গড়া সংগঠন অকস্মাৎই মুখ থুপড়ে পড়ে যায়। সেই ব্যবস্থাই দৃঢ়তা লাভ করে টেকসই হয় যা ধীরে সুস্থে প্রয়োজনীয় ও নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় গুলো যুৎসইভাবে প্রয়োগ বা বাতিল করে থাকে। ঘাস আজ গজালে কালই নুঁইয়ে পড়ে, কিন্তু ফলদায়ী বৃক্ষ দেরীতে পরিপক্কতা লাভ করে আর কখনও শতাব্দীকাল ধরে দণ্ডায়মান থেকে ফলদান করতে থাকে। অতএব, ভবিষ্যতে আমাদের জামাত পর্যায়ক্রমে যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকবে তেমনি ওসীয়্যতের মাধ্যমে বিশ্বে যে ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারও প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ বর্ধন পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি রেখেই আল ওসীয়্যত পুস্তকে বলেছেন-

"এ ধারণা করো না যে এটা এক সুদূর পরাহত ব্যাপার। বরং এটা সেই মহা পরাক্রমশালীর নির্ধারণ যিনি ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের মালিক।

আমাদের এজন্য ভয় নাই যে এতো অর্থ সম্পদ কী করে জমবে আর এমন জামাত কী করে সুগঠিত হবে যারা বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে বীরত্বপূর্ণ এই কাজ করে দেখাবে। বরং আমাদের এই আশঙ্কা হয় যে, আমার যুগের পর সেই সব লোক যাদের কাছে এতো অধিক অর্থ সম্পদ গচ্ছিত হবে তারা অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য দেখে বিভ্রান্ত না হয়ে পড়ে, আর পার্থিব জগতের মোহে না পড়ে যায়। তাই, আমি দোয়া করছি যে, এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গ এ জামাতে সর্বদা আসতে থাকুন, যারা খোদার প্রতি নিবেদিত হয়ে দায়িত্বরত থাকবেন। হ্যাঁ, বৈধ হবে তার জন্য, যার দিন যাপনের সংস্থান নেই, দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাকে এথেকে দেয়া যাবে"।

'ওসীয়্যত'- টাকা জমা হবার চমৎকার এক স্রোতধারা

অর্থাৎ আমার সে বিষয়ে চিন্তা নেই যে ওসীয়্যতের কারণে এত বেশী টাকা কোথা থেকে আসবে বরং আমার চিন্তা হলো অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য দেখে লোকেরা না হোঁচট খায়। তোমরা তো একথা বলছো যে গোটা বিশ্বের গরীবদের জন্য উন্নততর ব্যবস্থা কীভাবে করা হবে আর এত টাকা কড়ি আসবেই বা কোথা থেকে, যা দিয়ে তাদের চাহিদাগুলো পুরণ করা যাবে? তবে, এ বিষয়ে আমার কোন চিন্তাই নেই যে এত টাকা কোথা থেকে আসবে। এই টাকা পয়সা আসবে, আর অবশ্যই আসবে। আমার দুশ্চিন্তা তো হলো অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য দেখে দুনিয়ার চোখগুলো না ছানাবড়া হয়ে ওঠে আর সেই সব লোক যাদের কাছে এই টাকা কড়ি বন্টনের দায়িত্ব ন্যস্ত তারা না পার্থিবতার মোহে পড়ে লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে সেই হিসাব অনুযায়ী টাকা ব্যয় না করে, যে অনুপাতে মুখাপেক্ষীদেরকে দেয়ার জন্য তা জমা করা হয়েছে।

এ প্রশ্ন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) স্বয়ং উঠিয়েছেন আর এর জবাবও তিনি নিজেই দিয়েছেন। লোকেরা এ ধারণা করবেন না যে এতো অর্থ সম্পদ কোথা থেকে আসবে? আসবে আর অবশ্যই আসবে। ভয় যদি থাকে তা এই যে, অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য দেখে লোকেরা না জাগতিক সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ইহজগতের প্রেমে বিভোর হয়। কেননা টাকা একত্রে জমবে, এত বেশী জমবে যে, কোটি কোটি টাকা জমা হয়ে যাবে। এত বেশী অর্থ সম্পদ জমবে যে আমেরিকা তা কখনও দেখেনি, না রাশিয়া কখনও তা দেখেছে, ইংল্যান্ডও তা কখনও দেখেনি। দেখেনি জার্মানী, ইতালী ও জাপানও। এমন কী সবগুলো রাষ্ট্রের সরকার সম্মিলিত ভাবেও এই পরিমাণ অর্থ কখনও জমা করেনি, যে বিশাল অঙ্কের টাকা এই পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় তহবিলে একত্রে জমা হয়ে যাবে। যেহেতু এ পদ্ধতিতে ধন সম্পদ এত বেশী একত্রিত হবে যে জাগতিক চক্ষু ইতোপূর্বে কখনও তা দেখতে পায় নি। এ জন্য আমি ভয় পাচ্ছি যে, পাছে লোকদের অন্তরে অবিশ্বস্ততা না ভর করে। অতএব, তোমরা এ বিষয়ে চিন্তা করো না যে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ কী করে কার্যকর রূপ নেবে বরং তোমরা এ বিষয়টি ভাবো যে ওই বিপুল পরিমাণ অর্থের সঠিক ব্যবহার করার উপযুক্ততা নিজ মাঝে গড়ো । অর্থ সম্পদ তোমার হাতে অবশ্যই আসবে কিন্তু তোমাদের আত্মার এমন সংশোধন করতে হবে যে ওই সম্পদ তোমাদের হাত দিয়ে বিশ্বের কল্যাণে সঠিক ভাবে যেন ব্যয়ীত হয়।

খাজা কামালউদ্দিন সাহেবের উপর 'আল ওসীয়্যত'-এ বর্ণিত নব ব্যবস্থার বিশেষ প্রভাব বিস্তার

এই সুযোগে বিরোধিভাবাপন্ন এক ব্যক্তির প্রশংসা না করে আমি পারছি না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল ওসীয়্যত পুস্তিকা লিখা শেষ করে ছাপার জন্য এর পাণ্ডুলিপি যখন বাইরে পাঠালেন খাজা

কামালউদ্দিন সাহেব তা পড়তে শুরু করেন আর তা পাঠ করতে করতে আত্মহারা হয়ে পড়েন। তার পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি এতটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে যে নিজ উতর চাপড়িয়ে সে বলতে থাকে 'বাহবা-বাহবা মির্যা! তুমি তো আহমদীয়াতকে মজবুত ভিত্তির ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছো'। খাজা সাহেব 'এর' সৌন্দর্যের একপিঠ দেখতে পেয়েছিলেন বটে তবে পুরোটা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি। আল ওসীয়্যত পুস্তিকা সঠিকভাবে মনোযোগের সাথে পাঠ করলে এ কথাই বলতে হতো যে, "বাহবা মির্যা! তুমি তো ইসলামের শিকড় মজবুত করে দিয়েছো! আহা মির্যা তুমি তো মনুষ্যত্ব ও মানবতার মূলও সর্বকালের জন্য সুদৃঢ় করে দিয়েছো। *আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ওয়া আলা আবদিকাল মসীহেল মাওউদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ"*।

তাহরীকে জাদীদের অবকাঠামো 'নেযামে নও' এরই ক্ষুদ্রাকৃতির এক পূর্বাভাস

আমি পূর্বে যেমনটা বর্ণনা করে এসেছি যে, এটা সময়ের দাবী আর সেদিনের প্রতীক্ষা, যেদিন সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়াত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। বর্তমানের আয় তো এমন যে কেন্দ্রও সঠিক ভাবে চালানোর মত নয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়ে তাহরীকে জাদীদের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন যাতে এ দিয়ে এখনই কেন্দ্রীয় এক তহবিল গঠন করা যায় আর কেন্দ্রীয় এক স্থান নির্ধারণ করে তাতে অবকাঠামো দাঁড় করানো যায়, সেই সাথে এর সদ্ব্যবহার করে আহমদীয়াতের বিস্তার ত্বরান্বিত করা যায়। তাহলে 'তাহরীকে জাদীদ'-টা কী! এটা হলো খোদা তাআলার সমীপে ঈমানের এক উপহার উপস্থাপন করা, ওসীয়্যতের মাধ্যমে তুমি সমগ্র বিশ্বে মহান যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছো, তা আসতে বিলম্বিত হচ্ছে, এজন্য আমরা যদ্দিন ওসীয়্যত ব্যবস্থা সুদৃঢ় না হয় তোমার সমীপে মহান ওই ব্যবস্থাপনার ছোট এক নমুনা চিত্র 'তাহরীকে জাদীদ'-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করছি, আর এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় যে তহবিল গড়ে ওঠবে, তা দিয়ে আহমদীয়াতের প্রচার বৃদ্ধি করা হবে। সেই তবলীগের ফলে ওসীয়্যতের বিস্তার লাভ হবে।

নেযামে নও (নব-বিশ্ব ব্যবস্থা) এগিয়ে আনবার উপায়

প্রচার কার্যক্রম যত বাড়তে থাকবে লোকেরাও সেভাবে আহমদী হতে থাকবে আর ওসীয়্যত ব্যবস্থা ক্রমেই প্রসারিত হয়ে বিস্তৃততর হতে থাকবে। এভাবে অধিকহারে অর্থ সম্পদ জমা হতে শুরু হয়ে যাবে। নিয়ম হলো-রেলগাড়ী শুরুতে ধীরে চললেও পরে অনেক বেশী দ্রুতগতি লাভ করে। একই ভাবে নিজে দৌড় দিলেও দেখবে Starting Point Avi Finishing Point এ দৌড়ানোর ভঙ্গিতে বিস্তর ফারাক থাকে। অতএব, ওসীয়্যতের মাধ্যমে অর্থসম্পদ জমা হওয়াটা বর্তমানে পরিমাণে বেশী নয় বটে তবে প্রচার কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ার পর আমাদের জামা'তে যখন দলে দলে লোকজন আসতে থাকবে তখন অর্থ সম্পদও অনেক বেশী বর্ধিত হারে বায়তুল মালে জমা হতে শুরু করবে। আর অলৌকিকভাবে অর্থ সম্পদের একেকটি কাড়ি আশে-পাশের অর্থ সম্পদকেও কাছে টানতে শুরু করবে। ওসীয়্যতের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে যতই বাড়বে, নব বিশ্বব্যবস্থার রূপদান ইনশাআল্লাহ তাআলা ততই এগিয়ে আসবে।

তাহরীকে জাদীদ নব বিশ্বব্যবস্থার অগ্রদূত স্বরূপ

তাহরীকে জাদীদ যদিও ওসীয়্যতের পর চালু হয়েছে তবুও কুরবাণী অনুশীলনের মানদন্ডে এটা ওসীয়্যতের পূর্বসূরী।

ইলিয়াস নবীর ভূমিকা মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ.) এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যেমন, তেমনি তাহরীকে জাদীদের কর্মসূচী ওসীয়্যতের নব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত স্বরূপ। তাঁর (ইলিয়াস নবীর) আগমণ যেভাবে ঈসা (আ.) এর আবির্ভাব ও বিজয়ের শুভ সংবাদ আগাম বয়ে এনেছিল, তেমনি প্রতিটি ব্যক্তি যারা তাহরীকে জাদীদের কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করে তারা ওসীয়্যত ব্যবস্থা কার্যকর করায় বিশেষ ভূমিকা রাখে আর যারা এভাবে ওসীয়্যতের বিস্তার ঘটায় তারা নব বিশ্ব বিনির্মাণে সবিশেষ অবদান রাখে।

সারসংক্ষেপ এ ভাবে টানা যায় যেমনটা আমি বলেছি, 'ওসীয়্যত' ইসলাম প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় নির্দেশাবলীর ধারক। কোন কোন ব্যক্তি ভুলক্রমে মনে করে ওসীয়্যতে আহরিত অর্থ সম্পদ শুধুমাত্র প্রচার কার্যক্রমকে তুলে ধরতে ব্যয়িত হবে। ভুল কথা! এটা যথাসিদ্ধ নয়। ওসীয়্যতের অর্থ বাহ্যিকভাবে প্রচার এবং সেই প্রচারের কার্যকর রূপদান উভয়েরই জন্য। প্রচার কার্যক্রম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি সেই নব ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নও এতে নিহিত, যার আওতায় সম্মানজনকভাবে প্রত্যেকের জীবনোপকরণ জোগানো হবে। ওসীয়্যতের ব্যবস্থা যখন পূর্ণাঙ্গীন রূপ পাবে তখন তদ্বারা কেবল প্রচারই হবে না বরং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের চাহিদাকে এ দ্বারা মিটিয়ে দেয়া হবে আর সমগ্র বিশ্ব থেকে দুঃখ দুর্দশা বিদূরীত করে দেয়া হবে। ইনশাআল্লাহ! পিতৃ মাতৃহীন (এতীম)-রা ভিক্ষা চাইবে না, বিধবারা মানুষের কাছে হাত পাতবে না, অসহায়েরা কাতর চিত্তে ছুটা-ছুটি করবে না, কারণ ওসীয়্যত হবে এতীমের মা, যুবদের পিতা আর নারীর ভালোবাসা। বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে, পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ভালবাসা আর মমতাপূর্ণ ভ্রার্তৃত্বের বন্ধন নিয়ে একে অপরকে সাহায্য করবে। তার এ 'দান' প্রতিদান বিহীন থাকবে না বরং প্রত্যেক দাতা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে উত্তম

প্রতিদান পাবে। ধনীরা ক্ষতির মুখে পড়বে না, ঠকবে না দরিদ্ররাও। দেশে দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাঁধবে না বরং তাদের পরোপকারের ছায়া গোটা বিশ্বকেই ছেয়ে নেবে।

অতএব, হে বন্ধুগণ! মি. চার্চিল বিশ্বে নব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন না, পারবেন না রুজভেল্ট সাহেবও। 'আটলান্টিক চার্টার' এর ঘোষণাও নিরর্থক, এর রয়েছে নানাবিধ ত্রুটি আর বহুমুখী অপূর্ণতা। নব ব্যবস্থার প্রবর্তন তারাই সাধন করতে পারেন যারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হোন।

তাদের মনে বিত্তবানদের প্রতি আক্রোশ থাকে না আর গরীবদের প্রতিও থাকে না কোন অন্ধ মায়া, তারা প্রাচ্যেরও নন, নন প্রতীচ্যেরও। তারা হলেন খোদা তাআলার বার্তাবাহক-নবী। আর জগৎসমক্ষে তারা সেই শিক্ষাই উপস্থাপন করেন, যা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সত্য ও সঠিক পথ নির্দেশ করে। অতএব, বর্তমানেও সেই শিক্ষাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবে যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে বিশ্ব প্রাপ্ত হয়েছে আর ১৯০৫ ঈসাব্দে তিনি এরই ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।

জামা'তের সকল বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ এক নিবেদন

তাই আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবারই এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা উচিত আর সেই যুক্তি প্রমাণ গুলো বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা উচিত যা আমি এতক্ষণ বর্ণনা করে এসেছি। কেননা, সর্বত্র এমন ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যারা বলশেভিজম দ্বারা প্রভাবিত। এজন্য আমি 'বলশেভিজম' এর উপকারিতা গুলো উল্লেখ করেছি এবং এর অপকারিতাগুলোও তুলে ধরেছি। অনুরূপভাবে চলমান অন্যান্য সরকার ব্যবস্থাগুলোরও ভাল মন্দ বর্ণনা করেছি। অতএব, সে সবের ওপর চিন্তা ভাবনা করো, বিচার বিশ্লেষণ করো আর শিক্ষিত জনগোষ্ঠির কাছে ওসীয়্যতের উন্নত মর্যাদা তুলে ধরতে আলাপ আলোচনা করো। আমি আপনাদের সবাইকে দৃঢ়তার সাথে আশ্বস্ত করছি যে, উত্থাপিত এসব যুক্তি প্রমাণের খন্ডনকারী কোন প্রত্যুত্তর ওই সব আন্দোলনের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিদের কাছেও নেই। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, এই-ই হচ্ছে পদ্ধতি, যার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। একই ভাবে আজ থেকে ১৮ বছর পূর্বে ১৯২৪ ঈসাব্দে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমার মাধ্যমে 'আহমদীয়াত' নামক সন্দর্ভে মহিমামন্ডিত এক পদ্ধতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। দৃঢ় আস্থার সাথে আমি বলতে পারি যে এমন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিগত তেরো শতাদী কাল ব্যাপী তফসিরকারকদের মধ্যে কেউই করতে পারেন নি। আর নিশ্চিত ভাবেই উপস্থাপিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষন সহকারে সেই শিক্ষামালা এমনই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যে, যদিও এইরূপ দাবী করাটা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ তবুও দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এত ব্যাপক গভীরতা পূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নবী বা তাঁর স্থলাভিষিক্তগণ ছাড়া আজ পর্যন্ত কখনও আর কেউ করেনি। আমি আহ্বান করছি অনুরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অন্য কেউ করতে পারলে তার প্রমাণ আমার সামনে এনে দেখাক।

ওসীয়্যতকারী নব বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনে অংশীদার

অতএব, হে বন্ধুগণ! যারা ওসীয়্যত করেছেন বুঝে নিন যে, আপনাদের মধ্য থেকে যারা নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী ওসীয়্যত করেছেন তারা নব ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করে নিয়েছেন, এটা তাদের নিজেদের আর নিজ বংশপরম্পরা সুরক্ষাকারী ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর। আর যারা যারা তাহরীকে জাদীদে অংশ নিয়েছেন, বা তারাও- যারা সামর্থ্য না থাকার কারণে অংশ নিতে পারেন নাই তবে এই তাহরীকের সফলতার জন্য নিয়মিত দোয়া করে যাচ্ছেন, তারা সবাই ওসীয়্যত ব্যবস্থা বিস্তৃত করবার ভিত্তি রচনা করে চলছেন। তাই, হে আমার বন্ধুগণ! জাগতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধর্মের বিলোপ সাধন করে নির্মিত হচ্ছে এর বিপরীতে তোমরা ধর্মের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে তাহরীকে জাদীদ ও ওসীয়্যতের মাধ্যমে সেগুলো থেকে শ্রেয়তর পন্থা ও ব্যবস্থা প্রস্তুত করো। তবে দ্রুত করো, কেননা 'প্রতিযোগিতার দৌড়'-এ এগিয়ে থাকে যে, সে-ই জিতে যায়।

তাড়া হুড়ো করে ওসীয়্যত করার আবশ্যকতা

যত তাড়া তাড়ি পারো ওসীয়্যত করো, নব ব্যবস্থা শীঘ্র যেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সেই কল্যাণমন্ডিত দিন যেন এসে যায়, যাতে সর্বত্র আহমদীয়াতের তথা ইসলামের পতাকা পত পত করে উড়তে থাকে। সেই সাথে আমি উপস্থিত সব বন্ধুদের অভিনন্দন জানাচ্ছি যাদের ওসীয়্যত করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে আর দোয়া করছি আল্লাহ তাআলা তাদেরও সেই সৌভাগ্য দিন যারা এখন পর্যন্ত এই ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হন নি, তাদের সেই সৌভাগ্য হোক, তারাও এতে অংশ গ্রহণ করে জাগতিক ও পারত্রিক কল্যাণে যেন আশিসমন্ডিত হয়। আর বিশ্ব এই ব্যবস্থার কল্যাণে এতটা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক যে শেষ পর্যন্ত তাকে এটা মেনে নিয়ে স্বীকারোক্তি দিতে হয় যে কাদিয়ানের সেই জনপদ, যা ছিল অজ্ঞাত, অখ্যাত , নিভৃত এক গন্ডগ্রাম, সেখান থেকে এমন এক জ্যোতির্বিকাশ ঘটেছে যিনি সমগ্র বিশ্বের আধার ঘুচিয়েছেন, আর পৃথিবীর অজ্ঞতাকে দূর করে দিয়েছেন, দু:খ-কষ্ট, গ্লানিময় দুর্দশা থেকে বিশ্বকে বাঁচিয়েছেন। আর যিনি ধনী দরিদ্র, বড় ছোট ব্যবধান ঘুচিয়ে সবাইকে প্রেম প্রীতি ভালবাসা ও সৌহার্দের মমতাময় এক প্রেম ডোরে বেঁধে গোটা বিশ্বকে এক হবার সৌভাগ্য দান করেছেন।

ভাষান্তর : মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্

নবীগণের মোহর

তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অনুপম চরিত্র

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

[নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মহান চতুর্থ খলীফা ১৯৮৯ সনে যুক্তরাজ্যে ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) এর অনুপম চরিত্রের ওপর অন্তর্দৃষ্টি দান করে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পবিত্র কুরআন ইসলামের পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) কে "খাতামান্নাবীঈন" বা 'নবীগণের মোহর' আখ্যায়িত করে তাঁর যেসব বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছে, সেগুলি সুসংহতভাবে এ বক্তৃতায় তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচ্যের ভাষাবিদ ও পশ্চিমা লেখকদের মতামতের অপূর্ণতা গুলোর পূর্ণতা সাধন করে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ন্যায়পরায়ণতা ও জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং প্রাণীকূলের সাথে মহানবী (সা.)-এর ব্যবহারিক নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন পর্যালোচনা করেছেন এবং ১৯৮৯ সন ও বর্তমান সময়ের ঈশ্বর-নিন্দার ওপর বিতর্কমূলক সমসাময়িক বিষয়াদির ওপর সুচিন্তিত ইসলামী মত প্রদান করেছেন।

মহা নবী (সা.) এর জীবনী বর্ণনায় হুযূরের এটা এক অনুপম বক্তৃতা, যা ইতোমধ্যে মুসলিম সমাজে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছে এবং এর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা এক অনতিক্রম্য মানে লাভ স্থান করেছে। কোন লোক তার পরামর্শদাতার জন্য এতো বেশী আবেগাপ্লুত হন না, যেমনটা তিনি (রাহে.) হয়েছেন এবং ইতিহাসের গতিপথের পূর্ণ পরিবর্তন সাধন না করে মহান এক ব্যক্তিত্বের প্রতি এতো সক্রিয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদানের নমূনা বিরল।

আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকালাহু ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মাবাদ, ফা'উযুবিল্লাহে মিনাশ্ শায়তানির রাজীম, বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম–আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর রহমানির রাহীম। মালেকে ইয়াওমিদ্দীন। ইয়াকানা'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন। ইহ্ দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম। সিরাতাল্লাযিনা আন্ আমতা আলাইহীম। গাইরিল মাগযুবে আলাইহিম ওয়ালাজ্জালিন।

কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিছলুকুম ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহুউ ওয়াহেদ। ফামান কানা ইয়ারজু লিকাআ রাব্বিহি ফাল্ ইয়ামাল আমালান সালেহাঁউ ওয়ালা ইউশ্‌রিক বে ইবাদাতি রাব্বেহি আহাদা।

অর্থ : বল, আমি শুধু তোমাদের মতই একজন মানুষ, (কিন্তু) আমি এই ওহী পেয়েছি যে, তোমাদের খোদা হচ্ছেন একক। সুতরাং যে ব্যক্তি তার খোদার সাথে সাক্ষাতের আশা করে, তাকে সৎকর্ম করতে দাও এবং সে যেন ইবাদতে খোদার সাথে কাউকে শরিক না করে (সূরা আল কাহাফ, আয়াত : ১১১)

হোন্‌শ্লো নগরীর মাননীয় মেয়র মহোদয়, সম্মানিত সংসদ সদস্যগণ ও উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ–

আজ এখানে যে বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা হবে, তার কারণে এ অনুষ্ঠানকে আমরা খুবই পবিত্র এক মওকা বলে মনে করি। যে বিষয়টি আমি গভীরভাবে ভালবাসি, তা আপনাদের খেদমতে পেশ করতে আমি খুবই সম্মানিত ও আনন্দিত বোধ করছি।

অধ্যায়-১

কলেমা শাহাদত এবং মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে পশ্চিমা দর্শন

শুরুতেই আমি আপনাদের সামনে কলেমা শাহাদত পাঠ করেছি। তারপর পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা এবং সূরা আল কাহাফ এর একটি আয়াত আবৃত্তি করেছি, যেটা সাধারণত: বিষদভাবে পরিচিত একটি আয়াত। এটার দু'টো অংশ আছে; প্রথম অংশে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই', এবং অপর অংশে বলা হয়েছে, 'মুহাম্মদ (সা.) তাঁর দাস, একজন মানুষ একজন নবী'। নবী হিসেবে বিবেচনা করার আগে তাঁকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে মত প্রকাশ করতে গিয়ে প্রাচ্যের প্রসিদ্ধ ভাষা ও ইতিহাসবিদ 'গীবন' বলেন, "এটা হচ্ছে কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। বসওয়ার্থ স্মীথ তার লিখা গ্রন্থ 'Mohammad and Mohammedanism'-এ নিম্নরূপ মত প্রকাশ করেন : –'এটাই প্রায় একই রকম আশ্চর্যের বিষয় যে, গীবন, যিনি মুহাম্মদের প্রতি সার্বজনীন সিদ্ধান্তে এমন এক পূর্ণ ন্যায়বিচার করেছেন যে, শুরুতেই তার বলা উচিত ছিল যে, 'মুহাম্মদের ধর্ম এক চিরন্তন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এক প্রয়োজনীয় অলীক বস্তু দ্বারা গঠিত। যা হচ্ছে, খোদা কেবলই একক এক সত্ত্বা এবং মুহাম্মদ তাঁর নবী (পৃ: ৮২)।

এ কথাটাকে বর্ধিত করে স্মিথ বলেন, যেভাবে দেখতে চেষ্টা করেছি, এটা মুহাম্মদের নিজের প্রতি অথবা তার উম্মতের জন্য আরোপিত কোন অলীক কাহিনী ছিল না, যদি তাই হতো, তবে মুহাম্মদের ধর্ম যেভাবে উন্নতি করেছে,

তেমনটা কখনো করতে পারতো না অথবা এখনকার পর্যায়ে উঠে আসতে পারতো না' (পৃ: ৮২-৮৩)।

ইসলাম ধর্মের প্রতি চমৎকার এ পশ্চিমা দর্শন সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য আমরা বসওয়ার্থ স্মীথের, বিশেষ করে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। 'Mohammad and Mohammedanism' গ্রন্থে ইসলামের উন্নতি এবং পতনের যে দু'টি ধাপ আলোচনা করেছেন, তা আমি তার বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত করছি :

'ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দী যাবত খৃষ্টীয় জগৎ এর সমালোচনা অথবা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়নি; শুধু কেঁপেছে আর বশ্যতা স্বীকার করেছে। কিন্তু যখন মুসলমানরা ফ্রান্সের বুকে প্রথম বাধার সম্মুখীন হলো, তখন যেসব জাতি পূর্বে তাদের কাছে হেরে গিয়েছিলো, তারা শক্তি সঞ্চয় করলো, যেভাবে মাঝে মাঝে শিকারী কুকুরকে বেঁধে ফেললে গাভীর দল যেমনটি করে থাকে এবং যদিও তারা তখনো যুদ্ধ করার ঝুঁকি নেয় না, তথাপি নিজের পক্ষে পিছু হটা শত্রুদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হয়' (পৃ: ৫৬)।

এবার স্মীথ কর্তৃক রেকর্ডকৃত কুৎসা রটনার উদাহারণগুলো পাঠ করুন, তিনি বলেন, 'সকল পুতুল পুজার ধ্বংসকারী গোঁড়া মুহাম্মদকে সবশেষে স্বর্ণের ভক্তিপাত্রে পরিণত করলো এবং 'মমেট' নামের আড়ালে উপাসনার বস্তুতে পরিণত হবার খবর পাওয়া গেল' (পৃ: ৫৭)।

অত:পর তিনি বলেন, 'সে হলো একজন খৃষ্ট-বিরোধী, পাপাচারী, নীচলোক এবং তার চাইতেও যে কতো বেশী খারাপ তা জানি না, অথবা এটাও মনে করি না যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝ নাগাদ কোন একজন লেখকের এক অদ্ভুত ব্যতিক্রমী মন্তব্য ব্যতিত কেউ তাকে ভন্ড ও মিথ্যা নবী ছাড়া অন্য কিছু বলে আখ্যায়িত করেনি', (পৃ: ৬১)।

এ বিষয়ে আরো লিখতে গিয়ে 'রেনা'-র লিখার উদ্ধৃতি টেনে তিনি বলেন, 'চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'ব্যাফোমেট' এর অতিরঞ্জন এতোটাই অধিক যে, তিনি তাকে সব ধরণের সকল অপরাধের হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, ঠিক যেভাবে নাস্তিকতাবাদীরা 'আরিয়াস' এর বিরুদ্ধে দোষারোপ করেছে। তাদের ভাষায় মুহাম্মদ ছিলেন অনৈতিক কর্মের হোতা, একজন উপচোর, মৌলবাদী, যে মৌলবাদের উচ্চাভিলাষ পুরণে ব্যর্থ, জ্ঞাতিবর্গের বিরুদ্ধে তার হিংসা চরিতার্থ করতে এক নতুন ধর্মের আবিষ্কর্তা (পৃ: ৫৯)।' 'শয়তানীপূর্ণ কাজকর্মে সে ছিল এক দৃষ্টি আকর্ষণকারী স্থানের অধিকারী। 'ধর্মীয় কলহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'দান্তে' তাকে নবম স্থানের অধিকারী হিসেবে উল্লেখ করেছে' (পৃ: ৫৯)।

'ধর্মীয় বিপ্লবের নেতাদের কাতারে মুহাম্মদ হচ্ছেন সবার চাইতে মহান; তাঁর প্রতি সহানুভূতির মাত্রা খুব সামান্যই প্রদর্শন করা হয়ে থাকে এবং তাঁর প্রতি প্রদর্শিত ঘৃণা সম্ভবত: প্রাকৃতিক, যা তাদের জ্ঞানে বিপরীতে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। লুথার-এর এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে যে তিনি লিও-র চাইতে অধিক খারাপ কি-না, মেলাঙ্কথন-এর বিশ্বাস, তিনি হয় ইয়াজুজ অথবা মাজুজ এবং সম্ভবত: দুটোই"। (পাক্ষিক রিভিউ আর্ট ইসলাম-প্রণেতা ডয়েস নং ২৫৪, পৃ: ২৯৬, মোহাম্মদ ও মোহাম্মদানিজম বক্তৃতা-২ পৃ: ৫৯-৬০)।

অধ্যায়-২

ইসলামের ব্যাখ্যায় নবযুগ

দুর্ভাগ্যক্রমে, ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ এবং ঘৃণার চূড়ান্ত প্রকাশের এ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেনি। যাহোক, আমরা বাতাসে এক পরিবর্তন দেখতে পাই, যা ইংল্যান্ডের জনৈক বিশিষ্ট লেখক থমাস কার্লাইল মহোদয় ঘটিয়েছেন। ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন পথ দেখালেন। ঘৃণা দ্বারা আচ্ছাদিত এক যুগে তিনিই ছিলেন প্রথম গানের পাখী, যিনি সাহস ও মহত্বের সাথে নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসা গীত গাইলেন এবং তিনিই ছিলেন প্রথম দোয়েল, যিনি বসন্ত আগমনের ইঙ্গিত দান করলেন।

কার্লাইলের পর অবস্থা পরিবর্তিত হতে শুরু করলো কিন্তু তা স্থিতি পাবার প্রবণতা প্রকাশ পেলো না। তা বদলে এটা মধ্য পথে বাধাপ্রাপ্ত এক বিষয়ে পরিণত হলো। আমরা দেখি, মুহাম্মদ (সা.) এর সমালোচনার ইতিহাসে যত্রতত্র পয়দা হওয়া সালমান রুশদীব ন্যায় অনেক পন্ডিত ব্যক্তি অতীতে আত্মগোপন করলো। ধর্মীয় গোঁড়ামীর ইতিহাসে রুশদীর জন্ম কোন নূতন বিষয় নয়, এটা অজ্ঞতার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং সহনশীলতার অপ্রতুলতার ফলশ্রুতি, যা মানুষ ভালভাবেই অবহিত আছে।

মহান প্রাচ্য-ভাষাবিদ কার্লাইল-এর পরিচয় ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে। এখন আমি তার রচিত গ্রন্থ Heroes and Hero Worship দু'টো গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি বলেন–

'হায়! এমন মতবাদ খুবই শোচনীয়। আমরা যদি আল্লাহ্‌র আসল সৃষ্টির বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চাই তবে ঐসব মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করতে হবে! তারা হচ্ছে এক নাস্তিক যুগের সন্তান, তারা চরম দু:খজনক আধ্যাত্মিক পঙ্গুত্বের দিকে, এবং কেবলমাত্র মানব আত্মার মৃত্যুর দিকেই ইঙ্গিত করে : অধিকতর ঈশ্বর-বিহীন মতবাদ, যা আমার মতে, এ পৃথিবীতে কখনো ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। এক মিথ্যুক ব্যক্তি এক ধর্ম-প্রতিষ্ঠিত করেছে? যেমন, এক মেকিলোক একটি দালান তৈরী করতে পারে না! যদি সে আস্তর করার জন্য চুন, বালি ও পানি মিশ্রণ করার পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, যা দালান তৈরী করতে দরকার হয়, সেগুলি ব্যবহারের পদ্ধতি সত্যিকারে না জানে অথবা অনুসরণ না করে, তাহলে সে যা বানাবে, উহাকে বাড়ী তো নয়ই,

আবর্জনার স্তুপ ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। এমন একটি আবর্জনার স্তুপ আঠার কোটি মানুষের আবাস হিসেবে বার শতাব্দী ধরে টিকে থাকবে না, অবিলম্বেই ভেঙ্গে পড়বে' (পৃ; ২৭৯)।

তিনি মন্তব্য করেন :

"মিথ্যা সমূহ যাকে 'প্রবল আগ্রহ' বললে অত্যুক্তি হয় না, এ লোকটির চারদিকে স্তুপীকৃত হয়েছে, এগুলিকেবলই আমাদের জন্য অপমানজনক। পোকোক যখন গ্রোটিয়াসকে জিজ্ঞেস করলো–কবুতরের সেই গল্পের প্রমাণ কোথায়, যাকে মোহামেতের কর্ন থেকে মটর খুঁটে নিয়ে সেই দেবদূতের দিকে পাঠানোর তালিম দেয়া হয়েছিল, যে তাকে ওহী পাঠ করে শুনাতো? গ্রোটিয়াস জবাব দিয়েছিলো, কোন প্রমাণ নেই। ওগুলি অগ্রাহ্য করার সঠিক সময় এখনই" (পৃ: ২৯৭)।

কলেমা শাহাদতের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও অতীব জরুরী একটি বিশেষণ হচ্ছে 'আব্দ' শব্দটি, যা নবী (সা.) কে একজন মানুষ ও দাস হিসেবে বর্ণনা করে। একজন মানুষ যিনি এতোই খাঁটি যে, তিনি তার প্রভুর কাছে সর্বোচ্চ উৎসর্গীকৃত দাস ছিলেন। আজ আমি মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের ওপর আলোচনায় যাব না, কিন্তু একজন মানুষ, আল্লাহ্‌র একজন সাধারণ দাস এবং একজন বিনীত মানুষ হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর আলোকপাত করবো যিনি সারা জীবন তাঁর ভাইদের, সাহাবাদের এবং শত্রুদের মধ্যে একজন খাঁটি লোক হিসেবে জীবন যাপন করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি তাঁর বাস্তব জীবনের কতিপয় সত্য ঘটনা বেছে নিয়েছি এবং সেগুলি আপনাদের সাথে আমি এজন্য শেয়ার করতে চাই যে, আপনারা বিচার করে দেখুন যে তিনি মানুষের এতোখানি কাছে থেকেও কতো বেশী আলাদা ছিলেন। 'আব্দ হয়েও' কথাটি আমি কেন বলছি, সেটা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, একজন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী সর্বদা তার শত্রুদের দ্বারা বিতর্কিত হয়ে থাকে। এক প্রান্তে নবী থাকেন তাঁর প্রভুর কাছাকাছি, আর অন্য প্রান্তে তিনি থাকেন মানবের সাথে সম্পৃক্ত। সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রেরিত হবার বিষয়ে তাঁর দাবীর সত্যতা মানুষ বিচার করতে পারে না, কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি কেমন, তা মানুষ অবশ্যই বিচার করতে পারে। মানুষ হিসেবে যদি তিনি একজন খাঁটি মানুষ হন, তবে তার পক্ষে মিথ্যা নবী হওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার।

পুণরায় আমি জনাব বসওয়ার্থ স্মীথের উল্লেখ করছি, যিনি স্যার উইলিয়াম ম্যুর-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'মুহাম্মদ ছিলেন একজন মধ্যম উচ্চতার এবং এক শক্ত কাঠামোর মানুষ, তাঁর মাথা ছিল বড় এবং তাঁর সুদৃশ্য যুগল-ভ্রূর উপরে প্রশস্ত কপাল জুড়ে ছিল কঠিনভাবে চিহ্নিত শিরা, যা তিনি রাগলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে স্পষ্টভাবে স্পন্দিত হতো। তাঁর চোখ দুটো ছিল কয়লার মত কালো এবং মর্মভেদী উজ্জল। তাঁর কেশ ছিল কিঞ্চিত চূর্ণ-কুন্তল, তাঁর দাড়ি ছিল অন্যান্য প্রাচ্য ভাষাবিদদের দাড়ির মত লম্বা, যা গভীর চিন্তার মুহূর্তে তিনি নাড়াচাড়া করতেন, এতে তাঁর চেহারার গাম্ভীর্য বেড়ে যেতো। তাঁর পদক্ষেপ ছিল দ্রুত, যা পর্বতারোহীর পদচালনার মতো বলিষ্ঠ (পৃ: ৮৩)।

জনাব বসওয়ার্থ স্মীথ তাঁর গ্রন্থ 'মুহাম্মদ ও মুহাম্মদানিজম'-এর ১৮৭৪ সংস্করণে মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্র সম্পর্কে লিখেন, 'তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী এবং সরল বিশ্বাসের লোক। লোকেরা তাঁকে 'আল-আমীন' অর্থাৎ 'বিশ্বস্ত' বলে ডাকতো। তাঁর নিয়োগকর্তার মেষপাল দেখাশুনার কাজ, তাঁর সিরিয়া অভিমুখে যাত্রাসমূহ এবং স্বল্পকালীন অবস্থানের সময় সাধু 'সাজিয়ার্স' অথবা 'বাহিরা'-র সাথে গড়ে উঠে তাঁর বন্ধুত্ব, নির্যাতিতদের উদ্ধারের বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, ব্যবসার এক সাহাসী কাজে খাদিজা কর্তৃক তাঁর নিয়োগ লাভ এবং পরবর্তীতে সাথে তাঁর সুখময় বিবাহ বন্ধন এসব হচ্ছে তাঁর প্রাথমিক জীবনের উল্লেখযোগ্য বাহ্যিক ঘটনাবলী' (পৃ: ৭৫)।

যাহোক, একই গ্রন্থের ১৯৮৬ সনের সংস্করণে, যা তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছে, তা পাঠ করলে দেখতে পাই, এটা কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে :–

'তাবৎ স্বল্পভাষী এক লোক এবং অতি অল্প সংখ্যক বন্ধুসহ শেষ নাগাদ তার সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার নিজ ক্ষুদ্র পরিধিতে মহৎ ছিলেন। লোকে তাঁকে 'আল আমীন' বলে ডাকতো, যার অর্থ 'বিশ্বাসভাজন'। খাদিজা নাম্নী এক ধনাঢ্য মহিলা নিজ ব্যবসার তদারকি করতে সিরীয়াগমনের জন্য তাঁকে নিয়োগ করলেন। এভাবে মেষপালক মুহাম্মদ উটের পরিচালকে পরিণত হলো এবং তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বে তিনি এতোই বিশ্বস্ততা ও বিচক্ষণতার সাথে পালন করলেন যে, খাদিজা তাঁর সাথে নিজের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলেন। খাদিজা ছিলেন বয়সে তাঁর (সা.) চাইতে পনের বছরের বড়। বয়সের এ ব্যবধানটা এমনই ছিল যে, প্রাচ্যের আবহাওয়া-বিচারে খাদিজা তাঁর মা-ও হতে পারতেন। তথাপি এ বিবাহ ছিল প্রকৃত অনুরাগ ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, এবং বিবাহের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চব্বিশ বছর কাল মুহাম্মদ খাদিজার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং দ্বিতীয় কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নি, যদিও দেশের সর্বজনীন প্রথা মোতাবেক সে বিষয়ে সবাই তাকে সমর্থন জানাতো' (পৃ: ৯৫-৯৬)।

কার্লাইল সাহেব তার উপর্যুক্ত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাথমিক জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন. 'জীবনের শুরু থেকেই তিনি একজন চিন্তাশীল লোক বলে অভিহিত হন। তাঁর সাথীরা তাঁকে 'আল আমীন' অর্থাৎ 'বিশ্বস্ত' উপাধি দিয়েছিলো। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত; কর্মে কথায় এবং চিন্তায় সৎ। তারা উল্লেখ করেন যে, তিনি সর্বদা অর্থবহ কথা বলতেন। তিনি ছিলেন বাস্তবেই এক মৌন স্বভাব সম্পন্ন, বলার মত কিছু না থাকলে চুপ থাকতেন, কিন্তু যখন কথা বলতেন, প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতেন, বিজ্ঞ আন্তরিক ছিলেন, সর্বদা বিষয় বস্তুর ওপর আলোকপাত করতেন। তাঁর সম্পর্কে ব্যক্ত করার মত যোগ্য বক্তব্য কেবল এটিই। তাঁর সারা

জীবন আমরা তাঁকে সর্বোতভাবে দৃঢ়তাসম্পন্ন, ভ্রাতৃসুলভ, আন্তরিক চারিত্রের খাঁটি লোক হিসেবে বিবেচিত হতে দেখেছি। তিনি ছিলেন গম্ভীর, আন্তরিক চরিত্রের অধিকারী তথাপি অমায়িক বন্ধুসুলভ, আন্তরিক সাথী হবার যোগ্য, এমনকি হাসিখুসী, অধিকন্তু হাস্য রশিক; এমন লোকও আছে যাদের হাস্য তাদের যে কোন বিষয়ের মত মিথ্যা, তারা প্রাণ খুলে হাসতেও জানে না। কোন মানুষ কেবল মোহামেত এর সৌন্দর্য, তার সুন্দর, বিচক্ষণ ও আন্তরিক মুখমন্ডল, বাদামী-রক্তিমাভ বর্ণ, রশ্মি বিকিরণকারী কালো চোখের বর্ণনা শুনেই থাকবে; আমি যেভাবেই হোক, তার ভ্রূর উপরের সেই শিরাটি পছন্দও করি, যেটা তাঁর রাগের সময় কালো রঙে প্রসারিত হতো' (পৃ: ২৮৭-২৮৮)।

নবুওত লাভের পূর্বে মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাথীদের মধ্যে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের এক জীবন কাল অতিবাহিত করেন। সে সময় পর্যন্ত তাঁর কঠোরতম সমালোচকরাও তাঁর চরিত্রে কোন ধরনের কলঙ্কের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করতে সমর্থ হয়নি। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতানৈক্য বা ভিন্নমত নেই। এমতাবস্থায় যারা তাঁকে অমান্য করে, পবিত্র কুরআন তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করে বলে,

অর্থাৎ–'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে এর পূর্বে আমার সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছি, তাহলে কেন তোমরা তোমাদের প্রজ্ঞা প্রয়োগ কর না? (সূরা ইউনুস আয়াত : ১৭)। তোমরা কি দেখনা যে, এক লোক যিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর এক অনিন্দ্য-জীবন যাপন করেছেন, তিনি হঠাৎ করে পৃথিবীর বুকে এক উচ্ছৃঙ্খল লোকে পরিণত হয়ে গেলেন। সেই লোক যিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক লোকদের বিষয়ে কখনো কোন মিথ্যা কথা বলেনি, কিভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টি-কর্তা, যিনি তাঁকে এতো বেশী ভালবাসেন, তাঁর বিষয়ে মিথ্যা বলার সাহস পেতে পারেন? (চলবে)

ভাষান্তর : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

সাফল্যজনকভাবে উদযাপিত হলো মজলিস আনসারুল্লাহ, ঢাকা'র মিলন মেলা ২০১০

গত ২৬ শে মার্চ ২০১০ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মজলিস আনসারুল্লাহ, ঢাকা'র মিলন মেলা। একদিন ব্যাপী এই মিলন মেলার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিলো মুন্সীগঞ্জ এর 'পদ্মার চর'। মজলিস আনসারুল্লাহ, ঢাকা'র এই মিলন মেলা সকাল ৮ টায় নান্তা পরিবেশনের পর দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মোহাম্মদ আব্দুল জলীল সাহেব। বক্শী বাজার দারুত তবলীগ থেকে পদ্মার চরের উদ্দেশ্যে দুটি বাস ছাড়ে সকাল ৯টা ৮মিনিটে, এক রোমাঞ্চকর অনুভূতির মধ্যে দিয়ে শুরু হয় পথ চলা। ১০.৪৫ মিনিটে মুন্সীগঞ্জ অবতরণ করে, এবং ১১:০৫ মিনিটে লঞ্চে আরোহনের পর শুরু হয় পরিচয় পর্ব। পরিচয় পর্বের পরে কাঙ্খিত সেই স্থান পদ্মার চরে মিলন মেলার লঞ্চ পৌঁছে ১২.০৫ মিনিটে, তারপর সেখানে জুমআর নামায ও আসর নামায আদায় করা হয়। এই জুমআর নামায পড়ার জন্য সামিয়ানা টাঙানো সহ বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক কাজ করা হয়। নামায পড়ান মওলানা মাহমুদ আহমদ আনসারী সাহেব, নামায শেষে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব খালেদ বিন কাশেম সাহেব ও যয়ীম আলা মজলিস আনসারুল্লাহ ঢাকা। এরপর মোন্তাযেম উমুমী জনাব নুরুল ইসলাম মিঠুর পরিচালনায় শুরু হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। মিউজিকেল চেয়ার, লক্ষ্যভেদ, দড়ি টানাটানি ইত্যাদী। সব চেয়ে আকর্ষণীয় এক প্রতিযোগিতা শুরু হয় তা হল 'গল্প বলা', যে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন যৌথভাবে সর্বজনাব আব্দুল জলীল, নুরুল ইসলাম মিঠু, আক্তারুজ্জামান ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন সর্বজনাব মাওলানা মাহমুদ আহমদ আনসারী, আতাউর রহমান, মাকসুদুল হক। প্রতিযোগিতা শেষে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম এবং এর পরে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই মিলন মেলায় প্রায় ১০০ জনের মতো সদস্য উপস্থিত ছিলো। যার মধ্যে অল্প কিছু খোদ্দাম ও শিশু ও ছিলো। এই মিলন মেলায় সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য ছিলো শবনব বিনতে শহীদ (নিবিড়) যার (বয়স ৭), এবং বয়জ্যেষ্ঠ্য হিসেবে জনাব আলহাজ মীর মোহাম্মদ আলী (বয়স৭২)। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এর পরে দোয়ার মাধ্যমে ফেরার পালা শুরু হয়।

শোক সংবাদ

গত ১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখে সকাল ১০:০০ টায়

আমাদের মধ্যে থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন জনাব আলহাজ এ কে রেজাউল করীম সাহেব।

(ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। লিভারের অসুস্থতার কারণে তিনি ঢাকাস্থ আনোয়ার মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

তিনি ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি জামাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ, অডিও ভিডিও বিভাগের সূচনাকারী সেক্রেটারী, সেক্রেটারী ফাইনান্স, সেক্রেটারী ওসীয়ত এবং তিনি সর্বশেষ সেক্রেটারী ওমরে আমা হিসেবে জামাতের প্রভূত সেবায় আত্মনিয়োগ করে গিয়েছেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ২ ছেলে ৩ মেয়ে এবং ৭ জন নাতী-নাতনী সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি হজ করার ও ওসীয়তকারী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার কে সাবরে জামিল দান করুন ও তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মোকাম দান করুন। আমীন।

মালী কুরবানী ও ওসিয়্যত ব্যবস্থা

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমের সর্বত্র মালী কুরবানীর বিষয়ে এত পরিস্কার ও স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পরে না। কুরআন করীম মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই এ বিষয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। যে বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে বার বার নির্দেশ দিয়েছেন, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, এ আদেশ পালন না করলে তার কি পরিনাম হবে সে কথাও ব্যক্ত করেছেন, সেক্ষেত্রে এক মু'মিনের জন্য এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে কুরআন করীমই যথেষ্ট। কারন আল্লাহ্ তাআলার কথার ওপর আর কারো কথা থাকতে পারে না ।

কোন বিষয়ে কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ এক বার আসলেই তা মুমিনের জন্য যথেষ্ট। সেখানে যে বিষয়ে কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বার বার আদেশ দিয়েছেন, সে আদেশ পালনের জন্য বিশেষ ভাবে যত্নবান হওয়া প্রতিটি মু'মিনের একান্ত প্রয়োজন।

কোন বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার বার বার আদেশ দেয়াই প্রমান করে দেয় যে সে বিষয়ের গুরুত্ব কতটুকু। যেমন আমরা দেখি কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বিরাশি বার নামায কায়েম করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এখন এই বিরাশি বার কোন একটি বিষয়ে আদেশ দেয়াই প্রমান করে দেয় যে নামাযের গুরুত্ব কতটুকু। প্রত্যেকটি মুসলমান, প্রত্যেকটি আহমদী নারী পুরুষই জানে নামাযের গুরুত্ব কতটুকু। তেমনি ভাবে কুরআন করীমে মু'মিনদের আল্লাহ্ তাআলা তার রাস্তায় ধন সম্পদ খরচের জন্য বার বার আদেশ দিয়েছেন, এথেকেই এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। কারন আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের ভালবাসেন বলেই যে উপায়ে আমরা বেশী বেশী নেকী অর্জন করতে পারব আর আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা লাভ করতে পারব, সে বিষয়ে বার বার নির্দেশ দিয়েছেন।

খুব বেশী দূরে যাওয়ার দরকার নেই, কুরআন করীমের শুরুতেই সূরা বাকারার প্রারম্ভে আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বে ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন" অর্থাৎ (মুত্তাকী তারাই) যারা অদৃশ্যের ওপর ইমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। এ আয়াতে আমরা দেখতে পাই, ইমান আনা এবং নামায কায়েম করার পরই মুত্তাকী অর্থাৎ খোদা ভীরুর যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে সে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে। রিযিক বলতে শুধু টাকা পয়সা, ধন সম্পদ বুঝায় না, খোদা প্রদত্ত মেধা, কাজ করার শক্তি, মান সম্মান সবই এর অন্তর্ভূক্ত। খোদা প্রদত্ত এসব রিযিক আল্লাহ তাআলার দ্বীনের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারার ২৪৬ নং আয়াতে বলেছেন, "মানযাল্লাযী ইয়ুকরেযুল্লাহা কারযান হাসানান ফাইয়ুযায়েফাহু লাহু আযআফান কাসিরাহ, ওয়াল্লাহু ইয়াকবেযু ওয়া ইয়াবসুতু ওয়া ইলাইহে তুরযাউন" অর্থাৎ কে আছে যে আল্লাহ তাআলাকে নিজ ধন সম্পদ হতে উত্তম ঋন দিবে , যেন তিনি তা তার জন্য বহু গুণ বাড়িয়ে দেন ? এবং আল্লাহ্ ধন সম্পদ গ্রহণ করে থাকেন এবং বাড়িয়ে থাকেন এবং তোমাদেরকে তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় ধন সম্পদ খরচ করে, সে যেন তা আল্লাহ তাআলাকে ঋন দিল । অর্থাৎ তা কখনো বিফলে যাবে না। বরং তাকে বহুগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে তা বৃদ্ধি করতে থাকবেন । এখন প্রশ্ন জাগে, বহু গুণ বলতে কত গুণ?

আমরা দেখি এ দুনিয়ার সব জিনিস ক্ষণস্থায়ী, লয়শীল। কিন্তু পরকালীন জীবন চিরস্থায়ী, সেখানকার নেয়ামত রাজীও চিরস্থায়ী। তাই আল্লাহ তাআলার রাস্তায় আমরা যা কিছু দান করব, তার প্রতিদান এ পৃথিবীতে যেমন পাব, পরকালেও এর ফল চিরস্থায়ী ও চির কল্যানকর রূপে পাব। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জাগতিক তুচ্ছ ধন সম্পদ তার পথে খরচ করতে বলছেন, আর এর বিনিময়ে পর জগতে তিনি আমাদের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও কল্যান রাজী দান করবেন। এর কল্যান কখনো নিঃশেষ হবে না।

কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আল্লাহ্ তাআলার তো ধন সম্পদের কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং তার সকল সৃষ্টি, বিশ্ব জগতের সবকিছুই তার মুখাপেক্ষী। এখন কেউ যদি বলে আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত আছে, তার পথে খরচ করার প্রয়োজন কি? তিনি তো চাইলে যাকে যত খুশি দিতে পারেন। তবে আমাদের সম্পদ থেকে কেন আমরা তার জন্য খরচ করব?

এর জবাব হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার আমাদের ধন সম্পদের কোনই প্রয়োজন নেই। বিশ্ব জগতে যা কিছু আছে সবই তার । আমরা যে সম্পদ অর্জন করি এটাও তারই দেয়া সম্পদ। আমরা ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করব নিজেদের কল্যানের জন্য। আল্লাহ তাআলার নিকট নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। আল্লাহ তাআলা চান আমরা যেন আমাদের কষ্টার্জিত সম্পদ তার পথে

খরচ করে তার কাছে সম্মান যোগ্য হতে পারি, তার ভালবাসা লাভ করতে পারি। জাগতিক ধন সম্পদের বিনিময়ে তিনি আমাদের চিরশান্তির বেহেশত দান করতে চান।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তার সাহাবীগণ (রা.) আমাদের জন্য মালী কুরবানীর অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আপনারা খুব ভালভাবে জানেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে যেসব ধন সম্পদ ও উপঢৌকন আসত, তার সবই তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতেন। জাগতিক ধন দৌলতের প্রতি তার (সা.) কোনরূপ আকর্ষণ ছিল না।

একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.)কে মৃত্যুর সময়ের দিন গুলোতে জিজ্ঞেস করেন, ঘরে কি কিছু আছে ? জানা গেল এক দিনার আছে। তিনি (সা.) বলেন, একটি জিনিষ ঘরে রাখার অর্থ হচ্ছে খোদার সাথে সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা।

অপর একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা একটি খেজুরের টুকরার বিনিময়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো।

আপনারা জানেন মালী কুরবানীর ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)দের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রবন্ধের পরিসর দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় উল্লেখ করছি না।

মালী কুরবানী সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, এটি সুস্পষ্ট যে তোমরা একসাথে দুটি বস্তুকে ভালবাসতে পার না। আর তোমাদের জন্য সম্ভব নয় যে তোমরা সম্পদকেও ভালবাসবে, আবার খোদাকেও ভালবাসবে। কেবলমাত্র একটিকেই ভালবাসতে পার। সুতরাং সৌভাগ্যশালী সেই ব্যাক্তি যে খোদাকে ভালবাসে। যদি তোমাদের মাঝে কেউ খোদাকে ভালবেসে তার রাস্তায় সম্পদ খরচ করে তাহলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে তার সম্পদে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী বরকত দেয়া হবে। কেননা সম্পদ নিজে নিজে আসেনা, বরং খোদার ইচ্ছা অনুযায়ী আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি সম্পদকে ভালবেসে খোদার রাস্তায় কুরবানী করে না যা তার করা উচিৎ তাহলে অবশ্যই সে তার সম্পদ হারাবে। এটি ধারনা করো না যে সম্পদ তোমাদের চেষ্টায় অর্জিত হয় বরং এটি খোদা তাআলার পক্ষ থেকে আসে। আর কখনো এটা মনে করনা যে খোদার রাস্তায় কিছু খরচ করে বা অন্য কোন ভাবে খেদমত করে তুমি খোদা ও তার ফিরিশতাগণের ওপর অনুগ্রহ করছ। বরং এটা তার অনুগ্রহ যে এ সেবার জন্য তিনি তোমায় বেছে নিয়েছেন। (ইশতেহার ৩য় খন্ড ৩৯৭ পৃষ্ঠা)

এখন আমি ওসিয়্যত ব্যবস্থা সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর উদ্ধৃতি থেকে কিছু বলব। এ সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিজেই তাঁর আল ওসিয়্যত পুস্তকে সবকিছু খুলে বলেছেন। বিশেষ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। এ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আপনাদের হাতের নাগালেই রয়েছে। এটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই ওসিয়্যত ব্যবস্থা ও এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে আমরা আহমদীরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)এর জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের খলীফায়ে ওয়াক্তদের এ বিষয়ে বার বার তাকিদ দেয়া সত্ত্বেও এখনো আমাদের মধ্যে অনেকেই ওসিয়্যতের অন্তর্ভূক্ত হইনি। ওসিয়্যত করার কথা বলা হলেই আমাদের মধ্যে অনেকেই ওজর আপত্তি পেশ করেন যে ওমুক সমস্যা আছে, তাই ওসিয়্যত করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে পরিস্কার ধারনা থাকলে কখনো এ বিষয়ে কোন ওজর আপত্তি করার অবকাশ থাকে না।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কেবল এ যুগের মুজাদ্দেদ ও সংস্কারকই নন, তাকে আল্লাহ তাআলা উম্মতী নবুওয়াতের মর্যাদা দান করেছেন । আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাকে ওহী মারফত নবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক মু'মিনের পরিচয় তো এই যে আল্লাহর নবী যখনই কোন আদেশ দিবে কোন ওজর আপত্তি না করে স্ব উৎসাহে সে আদেশ পালন করবে। কেননা আল্লাহর নবী যে আদেশ দেন তা পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলারই আদেশ। কুরআনে আল্লাহ তাআলা অতীত যুগের অনেক নবীদের কাহিনী বর্ননা করেছেন। এ কাহিনী শুধু মন ভূলানো গল্প শুনানোর জন্য বর্ণনা করেননি। বরং তাদের কাহিনী থেকে শিক্ষা অর্জনের জন্য বর্ণনা করেছেন । আমরা দেখি অতীতে যারাই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবীদের আদেশ অমান্য করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আর যারা তাদের আদেশ মেনেছে তারা সফলকাম হয়েছে। কোন নবীর দ্বারা আল্লাহ তাআলা যে আদেশ জারি করাবেন বুঝে নিতে হবে তা পালনের মাঝেই আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। তার মাধ্যমেই আমরা খোদা তাআলার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভ করতে পারব। আর সে আদেশ পালন না করলে আমরা অনেক বড় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হব। আমাদের ঈমানী দুর্বলতার পরিচয় দেব।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল ওসিয়্যত পুস্তকে লিখেছেন, "কখনো মনে করো না যে খোদা তোমাদের বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা ভূমিতে রোপন করা হয়েছে। খোদা তাআলা বলেছেন, এ বীজ বর্ধিত হবে, পুষ্ট ও সুশোভিত হবে, চতুর্দিকে এর শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করবে এবং এক মহা মহীরূহে পরিনত হবে।"

এ বিরাট উদ্দেশ্য লাভের জন্য বিরাট কর্ম সূচীর প্রয়োজন এবং এর পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। 'আল ওসিয়্যত' পুস্তকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দু'টি স্থায়ী ও মহা

শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। প্রথমটি খিলাফত এবং অপরটি নেযামে ওসিয়্যত। খিলাফতের হাতে বিশ্বব্যাপী ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় হবে। নেযামে ওসিয়্যত খিলাফতের জন্য শক্তি যোগাবে। প্রথম শক্তি সৎকর্মশীল ও ন্যায় পরায়ণ জনশক্তি। দ্বিতীয় শক্তি অর্থ বা তহবীল। এমন তহবীল যা আল্লাহর নামে জমাকৃত তথা 'বাইতুল মালে' জমাকৃত অর্থ। যে অর্থের ওপর কোন ব্যাক্তির একক অধিকার থাকবে না। খলীফার হাতে বাইতুল মালে সে অর্থ জমা হবে এবং অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ইসলাম প্রচার ও অন্যান্য জরুরী কাজে ব্যয় হবে।

একজন ওসিয়্যত কারী কি পাবেন, এটাও জানা প্রয়োজন। প্রথমত : হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন , "ওসিয়্যতকারী আল্লাহ তাআলার ফযলে জান্নাতী হবেন। তিনি 'আল ওসিয়্যত' পুস্তকে লিখেছেন, "কেউ যেন এটা মনে না করে যে, শুধু এই কবরে প্রবিষ্ট হলেই কোন ব্যাক্তি কিভাবে বেহেশতী হতে পারে ? কারন এর অর্থ এই না যে এ জমি কাউকে বেহেশতী করে দিবে। বরং খোদার বাক্যের অর্থ এই যে কেবল বেহেশতীগণ এখানে সমাহিত হবেন।"

দ্বিতীয়ত ওসীয়্যতকারী মরনের পরে জান্নাতী হবেন। কিন্তু ইহকালেও আল্লাহ তাআলার খাস হেফাযতে থাকবেন। যেমন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আমি স্বয়ং অনুভব করি যে এ ঐশী নেযামের ব্যবস্থাপনার সংবাদ পাওয়া মাত্র যে সকল ব্যাক্তি কোন ইতস্ততঃ না করে চিন্তিত হয়ে পরেন এবং সাকুল্য সম্পত্তির দশমাংশ খোদার পথে প্রদান করেন, বরং তদপেক্ষা অধিক নিজেদের উৎসাহ প্রদর্শন করেন, তারা নিজ ঈমানদারীর ওপর মোহর অংকিত করে দেয়। (আল ওসিয়্যত পৃষ্ঠা ৪৮)

তৃতীয়ত: নেযামে ওসিয়্যত সন্তানদের তালীম তরবিয়ত, চরিত্র গঠন ও আল্লাহ তাআলার খাস হেফাযত লাভের উপায় স্বরূপ হবে। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "হে আমার বন্ধুগন ! আপনারা বুঝে নিন, আপনারা যারা ওসিয়্যত করেছেন, তারা নেযামে নও এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন, যা আপনার বংশের হেফাযতের ভিত্তি পাথর।"

নেযামে ওসিয়্যতে শামিল হওয়ার জন্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বারংবার তাগিদ করেছেন। যেমন এক স্থানে তিনি (রা.) বলেছেন,"যদি দুনিয়ার মানুষ উন্নতি ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে চায় তবে তার জন্য একটিই মাত্র রাস্তা আছে আর তা হল এই যে নেযামে ওসিয়্যতের মাধ্যমে যে ব্যবস্থাপনা কায়েম করা হয়েছে সেটাকে চালু করা। (নেযামে নও পৃষ্ঠা ১১৭)

যারা ওসিয়্যত করে এ বরকতপূর্ণ নেযামে শামিল হতে চায় না তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "স্মরণ রাখতে হবে যে, এ (নেযামে ওসিয়্যতের) ঘোষণা ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য নয় বরং ভবিষ্যত আশংকা সম্বন্ধে যথা সময়ে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য, যাতে করে কেউ অজ্ঞতা বশঃত বিনষ্ট না হয় । প্রত্যেক বিষয় নিয়্যত বা উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমার উদ্দেশ্য দুঃখ দেয়ার জন্য নয়, বরং দুঃখ থেকে রক্ষা করার জন্য। ঐ সকল লোক যারা তওবা করে তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করা হবে। কিন্তু হতভাগ্য সে যে তওবা করে না। হাসি বিদ্রুপপূর্ণ বৈঠকাদি পরিহার করে না। দুস্কর্ম ও গুনাহ হতে নিবৃত্ত হয়না, তাদের ধ্বংশের সময় সন্নিকট। কারন তাদের ঔদ্ধ্যত্ত খোদার নিকট শাস্তি যোগ্য।" (আল ওসিয়্যত পৃষ্ঠা ৩০-৩১)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ যুগে পৃথিবীতে বহু আযাব গযব অবতীর্ন হবে। আল্লাহ তাআলার ক্রোধ এখন আযাব আকারে বর্ষিত হবে। সব সময় এমন হয় না। অতএব এ যুগে তওবা না করা মারাত্মক ভুল। ওসিয়্যত করে নেযামে ওসিয়্যতে শামিল হওয়ার অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করে তওবা করা।

অতঃপর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ওসিয়্যতকারী ও এ নেযামে যারা অন্তর্ভূক্ত না হয়, তাদের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে বলেছেন, "আমি স্বয়ং অনুভব করি যে এখানকার পরীক্ষা দ্বাড়াও উন্নত শ্রেণীর মুখলেস (খাঁটি ইমানদার) ব্যাক্তিগণ, যারা প্রকৃত পক্ষে ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়ের ওপর শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করবেন, তারা অন্যান্য লোকদের হতে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবেন এবং এটা প্রমাণ হবে যে বয়আতের প্রতিজ্ঞাকে তারা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং নিজের সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ করেছেন। এ ব্যবস্থা মুনাফেকদের নিকট ভারী বলে মনে হবে এবং এর দ্বারা তাদের অবস্থা ফাঁস হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর তারা পুরুষ হোক বা মহিলা এ কবরস্থানে কখনোই দাফন হতে পারবে না।" (আল ওসিয়্যত পৃষ্ঠা ৪৯)

আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, এ কথা গুলো একজন উম্মতী নবী এবং যুগ ইমাম বলেছেন। যারা ওসিয়্যতকারী তারা কমপক্ষে বাহ্যিকভাবে তো আদেশ পালন করেছেন। আল্লাহর প্রেরিত নবীর কথা মেনে নিয়েছেন। অতএব, তাদের তারা আশা করতে পারেন যে তওবা কবুল হবে। রূহানীভাবেও মু'মিন বলে গণ্য হওয়ার সকল সম্ভাবনা তাদের পক্ষে। কিন্তু যে ওসিয়্যত করেনি তার জন্য প্রমান করা কঠিন হবে যে সে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর আদেশের অবাধ্য হয়নি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তার আদেশ মেনে তার রাস্তায় বেশী বেশী মালী কুরবানী করার ও নেযামে ওসিয়্যতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে নাজাত লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন।

জহির উদ্দিন আহমদ

শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

হযরত ইমাম আবু হানিফা আন্ নো'মান (রহ.) এর কর্মময় জীবনের কয়েকটি দিক

সুন্নি সম্প্রদায়ের মাঝে যে চারটি মাযহাব প্রচলিত তা মূলত কিয়াস ও ইজতিহাদের মতবিরোধের ফলে। চিরাচরিত নীতি ও অবরোহমূলক তর্কশাস্ত্রের মাঝে যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় তাকেই কেন্দ্র করে হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী- এই চার মাযহাবের সৃষ্টি। কুরআন ও সুন্নার সাথে ঐ চার দলের কোন বিরোধ নেই; কেবল মাত্র কিয়াস, ইজতেহাদ, ইসতেহাসান ও ইসতেদলালের প্রয়োগভেদে সুন্নিজামাত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চার দলের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ ও তাদের শিষ্যবর্গরা ইসলামি আইন ও ব্যবহার তত্বের পুস্তক রচনা করেছেন। এর মধ্যে ইমাম মালিকের 'আল-মুয়াত্তা' অন্যতম।

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই মাযহাব নিয়ে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। ধর্ম-কর্ম পালনে মন নেই অথচ কে কোন মাযহাবের তা নিয়ে মারামারি। যদি প্রশ্ন করা হয় শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ শরীয়তবাহী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোন মাযহাবের ছিলেন তাহলে সবাই চুপ করে থাকবেন নিশ্চয়ই। হযরত রাসূল করীম (সা.)তো এ কথাও বলেছেন শেষ জামানায় ইমাম মাহদী (আ.) আসবেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলাম পুণরায় বিজয় লাভ করবে আর সকল জাতির জন্য তিনি ধর্ম সংস্কারক হিসেবে আসবেন তাহলে তিনি কোন মাযহাবের অধিনে কাজ করবেন? আর হযরত রাসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ইমাম মাহদী (আ.) যথা সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খলীফার নেতৃত্বে সারা বিশ্বের ১৯৭টি দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে লাখো ধর্মপ্রাণ আত্মনিয়োগ করে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে যার ফলে আজ আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপের ত্রিত্ববাদের দেশে-দেশে ইসলামের পতাকা পত পত করে উড়তে শুরু করেছে। রাসূল করীম (সা.) যেমন কোন মাযহাবের কথা উল্লেখও করেন নি তেমন হযরত ইমাম মাহদী (আ.)ও কোন একক মাযহাবের অনুসারী নয় বরং রাসূল যে আদর্শ প্রদর্শন করে গেছেন তারই পূর্ণ অনুসারী হবেন তিনি। তাই মাযহাব নিয়ে মতবিরোধ না করে আমরা এখানে হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা আন্ নো'মান (রহ.)এর কর্মময় জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, যাতে আমরা বুঝতে পারি তাঁর বৈশিষ্ট কেমন ছিল। ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তিনি তৎকালিন সময়ে ইসলামের অনেক সেবা করেছেন এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন আর পথহারা মানুষদের সঠিক পথে আনার জন্য নানান চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন। তাই ইসলামের ইতিহাসে হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা আন্ নো'মান (রহ.)এর সম্মান অনেক ওপরে।

হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা আন্ নো'মান (রহ.)এর কর্মময় জীবনের কয়েকটি দিক -ইমাম আযম আবু হানিফা আন্ নো'মান ইবনে সাবিত (রহ.) ৮০ হিজরীতে (৬৯৯ খ্রিঃ) ইরানের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায় তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৮০ হিজরীতেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেক (৬৮৫-৭০৫ খ্রিঃ) মুসলিম জগতের কর্ণধার ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই উমাইয়া বংশের দশজন খলিফা দামেস্কে রাজত্ব করেন এবং শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে হত্যা করে আস্ সাফ্ফাহ গৌরবজ্জল আব্বাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করেন (৭৫০ খ্রিঃ)। আবু হানিফা (রহ.) এর শেষ বয়সে খলিফা আল মান্সুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রিঃ) মুসলিম জগতের ভাগ্য নিয়ন্তা ছিলেন এবং তাঁর হাতেই এক অতি শোচনীয় পরিবেশে ইসলামের এ অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মৃত্যুবরণ করেন।

আবু হানিফা (রহ.) এর পিতা সাবিত ইব্ন যুতী (রাহ.) ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভুত রাজন্যবর্গের একজন। তাঁর দাদা যুতী (রা.) ছিলেন কাবুলের অধিবাসী। আবু হানিফা (রহ.) শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই ইল্ম ও ইসলামী সংস্কৃতির লালনভূমি কুফা নগরীতে বসবাস করেন এবং জ্ঞান আহরণ, বিতরণ এবং ইল্মী গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর পিতা একজন ধর্মভীরু সওদাগর ছিলেন। পুত্রের অসামান্য মেধা দেখে মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে পিতা তাঁকে নিজের ব্যবসায় জড়িত না করে উচ্চশিক্ষা দেয়ার জন্য মনোযোগী হন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র কুরআন হেফয্ করে হাফেযে কুরআনের মর্যাদা লাভ করেন।

আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন একজন একনিষ্ঠ ধর্মানুরাগী। দুনিয়াবী খ্যাতি-সম্মান বা অর্থ-সম্পদ কিছুতেই তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি খলিফা বা স্থানীয় শাসকদের অনুগ্রহ ভিখারি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর অফুরন্ত পাণ্ডিত্য ও ইসলামী ব্যবহারতত্ত্বে অনন্যসাধারণ জ্ঞানই তাঁর শেষ জীবনে ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি কুফা নগরীতেই স্বীয় কর্মস্থল নির্ধারণ করে সেখানেই বসবাস করতেন। সে সময় কুফার শাসনকর্তা ছিলেন ইবনে হুবায়রা নামক একজন স্বেচ্ছাচারী ও হৃদয়হীন লোক। তিনি আবু হানিফা (রহ.) এর পাণ্ডিত্যের কথা ও তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তির কথা শ্রবণ করে তাঁকে কুফা নগরীর কাজীর পদ গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। কিন্তু ধর্মভিরু আবু হানিফা (রহ.) এ লোভনীয় দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তাছাড়া গোলামীর জিঞ্জির তাঁর পছন্দ ছিল না। আবু হানিফা (রহ.) এর অস্বীকৃতিতে ক্ষমতা দাম্ভিক ইবনে হুবায়রার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বাদশা ইমাম সাহেবকে গ্রেফতার করে বেত্রাঘাত করার আদেশ দিলেন। কথিত আছে যে, ইমাম সাহেবকে বন্দি করে এনে প্রকাশ্য স্থানে এগারো দিন পর্যন্ত প্রত্যহ দশ ঘা করে বেত্রাঘাত করার পর তাঁকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কিন্তু দাম্ভিক শাসক আল মানসুর আবু হানিফা (রহ.)কে ক্ষমা

করলেন না। আবু হানিফা (রহ.) এর অপরাধ ছিল তাঁর নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা। তিনি আস্‌সাফ্‌ফাহ ও আল্ মানসুরের অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও ইসলাম বিরুদ্ধ জোরপূর্বক শাসনের প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেন। এ অপরাধে বাদশা আল্ মানসুর আবু হানিফা (রহ.)কে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং অনেকের মতে তাঁকে বিষ-প্রয়োগ করে হত্যা করতে গোপনে আদেশ প্রদান করেন। কারাকক্ষের অন্তরালেই ইসলামের এ প্রসিদ্ধ জ্ঞান সাধক পৃথিবীর বুকে ধর্মভীরুতা, স্পষ্টবাদিতা ও আত্মসম্মানের জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে (১৫০ হিজরী ৭৬৭ খ্রিঃ) এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

আবু হানিফা (রহ.) এর হাতেই 'ক্বিয়াস' মুসলিম আইনশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট শাখায় রূপায়িত হয়। এ 'ক্বিয়াস'- এর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশেই তাঁর হাতে 'ইস্‌তিহ্‌সান' বা ইকুইটীর উদ্ভব হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে 'ক্বিয়াস' ও 'ইস্‌তিহ্‌সান' এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছি- শরীয়ত অনুযায়ী বিক্রয় সম্বন্ধে কোনও চুক্তি করতে হলে বিক্রয়ের বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব চুক্তির সময় থাকা দরকার। এ নিয়মানুসারে কোন শিল্পী বা কারিগরের সাথে তার উৎপাদিত বস্তুর ক্রয়ের আগাম চুক্তি প্রথানুযায়ী 'ইস্‌তিহ্‌সান'। এ ধরনের চুক্তিকে ন্যায়সংগত হিসেবে আইনে স্বীকৃতি দেয়।

আবু হানিফা (রহ.) এর আরও অভিমত ছিল যে, 'ইজমায়' মুসলমানদের অধিকার সর্বকালেই আছে। গোঁড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মতে 'ইজমা'র অধিকার কেবলমাত্র আসহাবে রাসূলের সাক্ষাৎ সহচরদের এবং বড়জোর তাঁদের সহচরদের অর্থাৎ তাবেয়ীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আবু হানিফা (রহ.) উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেন যে, সর্বযুগের সর্ব মুসলিমদের ইজমায় নিরংকুশ অধিকার রয়েছে। প্রচলিত দেশাচার ও রীতিনীতি ও আইন-সংকলনের কাজে বিশেষ সহায়ক, ইসলামে এ মতবাদ তিনিই প্রথমে স্বীকার করেন যার ফলে মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্রে 'ফরফ্' বা দেশাচার ও প্রথার মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর মতে কুরআন ও হাদীস মুসলিম আইনশাস্ত্রের মৌলিক ভিত্তি। 'ইজমা'র স্থান তার পরেই এবং 'ক্বিয়াস', 'ইস্‌তিহসান' ও 'উরফ্' দ্বিতীয় স্তরের উপাদান মাত্র।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অনন্য কিছু বৈশিষ্ট ঃ

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর ধর্মমত ছিল উদার সূর্যালোকের মত স্পষ্ট ও মঙ্গলময়। জুমার খুতবা নিজ মাতৃভাষায় দেয়া যেতে পারে এ ব্যাপারেও একমত প্রকাশ করেছেন। যেমন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর কথা উল্লেখ করে আল মুহীতুল বুরহানী [(প্রণেতা ইমাম বুরহানুদ্দীন ইবনে মাজাহ) দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৭ পৃষ্ঠায় কিতাবুস সালাত আল ফাসলুল খামেস ওয়াল ইশরুন ফি সালাতিল জুমা] গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন 'খতিব সাহেব অবস্থা বিবেচনায় যদি ফার্সিতে খুতবা দেন হযরত ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিতে তা বৈধ।' মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে তিনি এমনই উদারমনা ও প্রগতিপন্থী ছিলেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) শুধু একজন উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন আলিমে দীনই ছিলেন না বরং একজন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় নেতৃস্থানীয় ধনাঢ্য ব্যবসায়ীও ছিলেন। লোভ-লালসা কখনো তাঁর উপর প্রবল হতে পারে নাই। তিনি ছিলেন সবার মাঝে পরম বিশ্বস্ত ও আমানতদার। কখনও তিনি আমানতদারীর মর্যাদা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। কারো সাথে আমানতের খিয়ানত করেছেন এমন অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কখনও করতে পারে নাই। তিনি ছিলেন উচ্চমানের দানশীল ও দাতা। কৃপণতার গুরুতর ব্যাধি থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পবিত্র। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। তিনি পবিত্র কুরআনকে সবচে বেশি সম্মান করতেন এবং অন্যদেরকে উপদেশ দিতেন কুরআন যেন নিয়মিত পাঠ করে। আল্লাহ ভীতি ও হালালের উপর সন্তুষ্টচিত্ত থাকার কারণে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা বিপুলভাবে লাভবান হতেন। এসব লভ্যাংশের বিরাট অংশ তিনি জ্ঞানঅন্বেষণকারী ও জ্ঞানদানকারী মুহাদ্দিস ও শায়খদের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করতেন। তিনি তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণকে আভ্যন্তরীণের মত সুন্দর ও অমলিন করার একান্ত প্রয়াসী ছিলেন। এ কারণে তিনি তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে বিশেষ নজর দিতেন। তিনি পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদেরকে পোশাক-আশাক এবং বাহ্যিক বেশ-ভূষা সুন্দর রাখার জন্য উৎসাহ দিতেন। তিনি ছিলেন খোশ মেযাজ, সুন্দর চেহারা ও উন্নত ললাটের অধিকারী। তিনি নিয়মিত আতর ও খুশবু ব্যবহার করতেন, (তারিখে বাগদাদ, ১৩ খণ্ড, পৃ: ৩৬০ ও আল খায়রাতুল এহ্‌সান পৃ: ৬১)।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর জীবনের বায়ান্ন বছর উমাইয়া খিলাফতে এবং আঠার বছর আব্বাসীয় খিলাফতে কাটান। মূলত তিনি ইসলামের দু'টি খেলাফত স্বয়ং গভীরভাবে দেখার সুযোগ লাভ করেন। উমাইয়া খেলাফতের জীবনকাল এবং তারপর সেই খিলাফতের পতন যুগও প্রত্যক্ষ করেন। আব্বাসীয় খিলাফতের সে যুগও তিনি দেখার সুযোগ পান, যখন পারস্য অঞ্চলে অত্যন্ত সংগোপনে এ আন্দোলনের সূচনা লাভ করে, আর সে আন্দোলন উমাইয়া শাসকগণের চোখের অন্তরালে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে।

এভাবে সে আন্দোলন পরবর্তীতে উমাইয়াদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং সফলতা লাভ করে। আব্বাসীয়গণ রাসূলুল্লাহ (সা.)এর নিকট আত্মীয়ের কারনে সত্যিকার অর্থে তাঁরাই খিলাফত তথা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারী, এ বলে জনগণকে তাঁদের আনুগত্য অপরিহার্য সাব্যস্ত করে এবং জনগণকে তাঁদের আনুগত্যের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাতে থাকে। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ সকল রাজনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই এবং তিনি এসব আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। এমন কি তিনি রাষ্ট্রদ্রোহীদের সাহায্যেও এগিয়ে আসেননি এবং আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের সাথেও তাঁর কোন সম্পৃক্ততা আদৌ ছিল না।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অত্যন্ত স্পর্শকাতর

মনের মানুষ ছিলেন। কারো কোনো দুঃখ-কষ্ট দেখলে ভেতর থেকেই তিনি উতলা হয়ে উঠতেন। অগ্রগামীতার, সর্বাধিক সাহসিকতার প্রমাণ দিয়েছেন। একবার মদীনায় চরম আতংক ও শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার প্রচন্ড আশংকা দেখা দিল। তখন কোন এক সময় মদীনার উপকণ্ঠে শোর-গোলের সৃষ্টি হলে লোকেরা সেদিকে দৌড়াতে শুরু করে। তারা সেখানে গিয়ে দেখলো, রাসূল (সা.) সবার পূর্বে সেখানে উপস্থিত এবং তিনি এ কথা সকলকে বলতে থাকলেন, তোমরা অযথা দৌড়াদৌড়ি করো না। সে সময় হুযূর (সা.) আবু তালহা (রা.)-এর ঘোড়ার ওপর বসা ছিলেন। যার ওপরে গদি ছিল না। ঘোড়ার পিঠ সম্পূর্ণ খালি অবস্থায় ছিল। রাসূল (সা.)-এর ঘাড়ে তলোয়ার ঝুলানো ছিল। তিনি তিনি (সা.) বলেন, আমি এ ঘোড়াকে পথে দৌড়ানো অবস্থায় পেয়েছিলাম। (বুখারী)

মহান আল্লাহ্ তাআলার অবারিত রহমত ও বরকত, সালাম ও দরূদ সেই বিশ্ব রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হোক, যিনি কেবল আধ্যাত্মিক সুরক্ষা অর্জনের প্রস্রবণ ধারাই জারী করেন নি–বরং শারিরীক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যও এরূপ অতুলনীয়, অসাধারণ দিক-নির্দেশনা উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে প্রদান করেছেন। মুসলমান জাতি যদি তাঁর এ সকল উপদেশাবলীর প্রতি পূর্ণ আমল করে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে তাহলে তারা পৃথিবীতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উদাহরণস্বরূপ এক অনন্য মডেল হতে পারবে এবং নিজেদের কর্মদ্বারা পৃথিবীর অন্য সকল উন্নত সভ্যতার দাবীকারকদেরকে স্বীয় অনুকরণে-অনুসরণে বাধ্য করতে পারবে। [আল ফযল, ২৪ জানুয়ারী, ২০০৮]

অনুবাদ : আহমদ জাকির হোসেন
ছাত্র, চতুর্থ বর্ষ
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষা

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

(শেষ কিস্তি)

স্বাস্থ্য সুরক্ষার ভিন্ন পদ্ধতি

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানব শরীর কর্তৃক প্রত্যেক প্রকারের অপবিত্রতা ও নোংরামী সৃষ্টির উৎসমূলকে কঠোরতার সাথে দমন করে সেগুলোর মুন্ডপাত করেছেন। এছাড়া তিনি রোগ বিস্তারের অন্যান্য ক্ষেত্রকেও চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা দ্বারা এটা প্রমাণিত। বর্তমানে মারাত্মক কিছু রোগ ও মহামারীর বিস্তার বিশেষত দু'টি কারণে হয়ে থাকে।

(১) আমরা আমাদের কফ, থুথু, নির্দ্বিধায় অলিতে-গলিতে, পথে-ঘাটে, খোলা জায়গায় ফেলে থাকি। এই নিক্ষিপ্ত কফ-থুথুর বিষাক্ত জীবাণুগুলি বাতাসের সাথে মিশে নাক-মুখের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে।

(২) যখন বিভিন্ন প্রকারের পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ এই নিক্ষিপ্ত আবর্জনায় মুখ দিয়ে খাদ্য-দ্রব্য বা পানিতে এসে পড়ে–সাথে করে সেগুলি অসংখ্য জীবাণু বয়ে নিয়ে আসে যেগুলি পানি ও খাবারের সাথে মিশে মহামারী ভয়াবহ বিস্তার ঘটায়।

আঁ হযরত (সা.) এর বিভিন্ন হাদীস থেকে বিভিন্ন রোগ বা মহামারী বিস্তারের উৎস সম্পর্কে জানা যায়। হুযূর (সা.) এর এমন অসংখ্য উপদেশবাণী রয়েছে যার ওপর আমল করলে এ সকল রোগের হাত থেকে বাঁচা যায়। উদাহরণস্বরূপ তিনি রাতের বেলায় প্লেট, হাড়ি-পাতিল, গ্লাস প্রভৃতি খোলা না রাখতে বলেছেন।

কেননা বিভিন্ন প্রকারের পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ রাতের বেলায় উড়ে বেড়ায় এবং সেগুলির আকর্ষণ সাধারণত খাদ্য-দ্রব্যের প্রতিই হয় হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (সা.) বলেছেন–"সন্ধ্যা হয়ে গেলে তোমরা তোমাদের সন্তানদের ঘর থেকে বের হতে দিও না কেননা শয়তান সেই সময় চারিদিকে ঘুরাফেরা করে। (হাদীসের দৃষ্টিতে শয়তানকে পারিভাষিক অর্থে বুঝিয়ে এর আওতায় চোর, ডাকাত, কুকুর অন্যান্য হিংস্র জন্তু, সাপ, বিচ্ছু, বিষাক্ত পোকা-মাকড় এবং ব্যাকটেরিয়া অন্তর্ভুক্ত বলে বুঝানো হয়েছে) যখন রাতের একটি অংশ অতিবাহিত হয় তখন বিসমিল্লাহ্ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। পানির পাত্র বিসমিল্লাহ্ বলে ঢাকনা বা পর্দা দিয়ে ঢেকে দাও এবং বাতি নিভিয়ে দাও।" [বুখারী, মুসলিম]

এটা মনে করা সমীচীন নয় রাসূল (সা.) রাতের বেলায় কেবলমাত্র খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখার উপদেশ দিয়েছেন বরং দিনের বেলাতেও খাবারের পাত্রাদি ঢাকার নির্দেশ দিয়ে এ কথার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন যে, দিনের বেলাতেও বিভিন্ন জীবাণু বাতাসের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। নিম্নোক্ত হাদীস পাঠে আমরা তা জানতে পারি।

"এক আনসারী সাহাবীর নাম আবু হামিদ, সে ব্যক্তি "নওকি" নামক স্থান থেকে এক পেয়ালা দুধ তোহফাস্বরূপ আনল। রাসূল (সা.) তাকে বললেন, তুমি কেন এটি না ঢেকে এনেছ। তুমিতো কমপক্ষে একটি কাঠের খন্ডও এর ওপর রেখে দুধের পেয়ালাটি ঢেকে আনতে পারতে। [বুখারী, মুসলিম]

যত্রতত্র কফ-থুথু না ফেলার জন্য রাসূল (সা.) আমাদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস থেকে এ সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। মসজিদের বারান্দায় থুথু ফেলে সেটিকে না মিটানোকে রাসূল (সা.) গুনাহের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, "মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহর কাজ। এর কাফফারা হল যদি থুথু ফেলাই হয় তা যেন মিটিয়ে দেয়া হয়।" [বুখারী] এই হাদীসে বিশেষভাবে মসজিদ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, মসজিদ সর্বাধিক ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য বর্ধনকারী জায়গাও বটে। সামান্য অসাবধানতাবশত এস্থান থেকে রোগ ব্যাধি মানুষের মাঝে ছড়াতে পারে। গভীর দৃষ্টি দিয়ে যদি অন্যান্য পাবলিক স্থানগুলির দিকেও লক্ষ্য করা হয় তাহলে সে স্থানগুলোতেও যত্রতত্র কফ-থুথু না ফেলার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রোগ-জীবাণু বিস্তার অনেকটা রোধ করা যেতে পারে।

আহার ও পানাহারের আদব-কায়দা

খাবার খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়া এবং কুলি করার কথা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এখন হাদীসে নববী (সা.)-এর আলোকে আহার ও পানাহারের কিছু আদব-কায়দার কথা তুলে ধরছি।

রাসূল (সা.) অধৈর্য ও অস্থিরতার সাথে খাবার না খাওয়ার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এটা ভদ্রতা গর্হিত ও অসামাজিক কার্যকলাপ বলে বিবেচিত। তাড়াতাড়ি ও হুলস্থুল করে খাবার খাওয়ার কারণে পাকস্থলীতে গন্ডগোল দেখা দেয় এবং তা দেহের ওপর প্রচন্ড খারাপ প্রভাব ফেলে। ডাক্তারগণ যে সকল ব্যক্তির পরিপাকতন্ত্রে সমস্যা রয়েছে, তাদেরকে ধীরেধীরে ভালভাবে খাবার চিবিয়ে খাওয়ার জন্য বলে থাকেন। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) প্লেটের মধ্য থেকে খাবার খাওয়া, প্লেটের চারপার্শ্বে হাত মাড়ানোসহ ভাল ও উৎকৃষ্ট খাবার বেছে বেছে নেওয়াকে অপছন্দ করেছেন। কিন্তু উন্নত জাতি ব্যতীত অধিকাংশ সভ্যতার পদচারণকারী ব্যক্তিগণ খাবার খাওয়ার এই ক্ষুদ্র পদ্ধতিটিও অনুসরণ করে না, বরং অনেকে এমন আছেন, তারা ভাবতেই পারে না, এতো আস্তে আস্তে কিভাবে খাবার খাওয়া যেতে পারে? এই পদ্ধতি অবলম্বন না করার ফলশ্রুতিতে তাদের পরিপাকতন্ত্রে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয় যা তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

একটি হাদীসের কথা এখন এস্থলে তুলে ধরছি–"হযরত আমর বিন সালামা (রা.) বলেন, আমি ছোট শিশু ছিলাম। আমার তরবিয়ত ও লালন-পালন রাসূল (সা.)-এর দ্বারাই হয়েছে। রাসূল (সা.) একবার আমাকে বললেন, বিসমিল্লাহ্ বলে ডান হাতে খাবার খাও এবং এক পাশ থেকে খাবার শুরু কর। [বুখারী ও মুসলিম]

এক নিশ্বাসে পানি পানের নিষেধাজ্ঞা

এক নিশ্বাসে পানি খাওয়া মানুষের অস্থিরতা, ধৈর্যহীনতা এবং মূর্খতাকে প্রকাশ করে থাকে। স্বাস্থ্যের জন্য এটা অত্যন্ত বিপদজনক বলে স্বীকৃত। হুযূর (সা.) এই বদ অভ্যাস দূর করার জন্য খুবই সুন্দর ও প্রজ্ঞার সাথে আমাদের নসীহত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তুমি উটের ন্যায় এক নিশ্বাসেই পানি পান করো না। বরং দুই-তিনবার বিরতি দিয়ে পান কর এবং যখন পানি পান করা শুরু কর তখন বিসমিল্লাহ্ বলো, আর যখন দ্বিতীয়বার পান কর তখন আলহামদুলিল্লাহ্ বলো।" [বুখারী]

একটানা পানি পান না করে বরং বিরতি দিয়ে পানি পান করার মধ্যে এই হিকমত বিদ্যমান ছিল যে, এর মাধ্যমে এভাবে খাদ্য পাত্রে আমাদের অসতর্কতাবশত নাকে-মুখে লুকিয়ে থাকা মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে। কেননা একটানা পানি পান করার ফলে ব্যাকটেরিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে গ্লাস এবং অন্যান্য পাত্রে বিষাক্ত বিষ ছড়িয়ে দেয়। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল করীম (সা.) পানি পানের সময়ে পানির মাঝে ফুঁক না দেওয়ার জন্য বলেছেন। এ বস্থায় এক

ব্যক্তি বলল, আমি যদি পানিতে ময়লা পড়ে থাকতে দেখি। রাসূল (সা.) বললেন, তখন তুমি কিছুটা পানি ফেলে দিবে। সে ব্যক্তি আবার বলল; আমি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তাড়াতাড়ি পানি পান করতে থাকি এবং পানির পাত্রে একাধারে শ্বাস ছাড়তে থাকি, রাসূল (সা.) তাঁকে বললেন, শ্বাস নেওয়ার সময় পানির পাত্র থেকে তোমার মুখ আলাদা করে নাও অত:পর শ্বাস ছাড়।

গোসলের শিক্ষা

নসীহত, উৎসাহ ও অন্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কালের পরিক্রমায় মানুষ গোসল করার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এ অভ্যাস নিজেদের মাঝে ধারণ করে চলছে। ইসলাম গোসল করার জন্য কিছু নসীহত করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে নি বরং এক্ষেত্রে সময় ও প্রয়োজনানুসারে কোন কোন গোসলকে ওয়াজিব আবার কোন কোন গোসলকে ফরজ বলে চিহ্নিত করেছে। জুমুআর দিনে গোসল করার ব্যাপারে বুখারী শরীফে নিম্নোক্ত হাদীস রয়েছে "জুমুআর দিনে গোসল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজীব"। তাই ইসলাম একজন প্রকৃত মু'মিনের জন্য কোন বাধ্য-বাধকতা ব্যতীত এক সপ্তাহের অধিক গোসল না করে থাকাকে কখনোই সমর্থন করে না। ইসলাম এক্ষেত্রে আরেকটু অগ্রসর হয়ে, বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় গোসল করা ফরজ বলে নির্ধারণ করেছে। মু'মিন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য বিশেষ সময় গোসল করা অত্যাবশ্যক। অত্যধিক সভ্য বলে পরিচিত পশ্চিমা কোন ব্যক্তি এই কথা বলতে পারে, গোসল তো একটি জরুরী বিষয়। একে ফরজ করার কি-বা ভিত্তি আছে? কিন্তু এই আপত্তির জবাব আজ পশ্চিমা সভ্যতার নামধারী লোকেরাই খন্ডন করেছে। সেখানকার অনেক উন্নত পরিবারে প্রতিদিন একবার গোসল করার অভ্যাস আছে। কিন্তু সরকার কিংবা ধর্মীয় কোন স্থান থেকেই নিয়মিত গোসল করার ব্যাপারে কার্যকরী আদেশ ও ব্যবস্থা না থাকার ফলে সেই দেশগুলোতে বসবাসকারী এমন অনেক গরীব ও অসহায় পরিবার আছে যারা নিজেদের আর্থিক দৈন্যদশার কারণে দিনে তো দূরের কথা, সপ্তাহে এমনকি মাসেও একবার গোসল করে না। কেননা সেখানে প্রচুর ঠান্ডা পড়ে যার ফলে গরম পানি করে গোসল করতে হয়। দু:খের সাথে বলতে হয়, তাদের সভ্যতা তাদের বাহ্যিক চাকচিক্য ও লৌকিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা উজ্জ্বল ও রঙ-বেরঙের জামা-কাপড় পরিধান করে, অত্যধিক সাজ-সজ্জা ও আড়ম্বরতা দেখিয়ে সন্ধ্যা বেলা বের হয়–তখন তাদের আধুনিক সভ্যতার এক আকর্ষণীয় মনোমুগ্ধকর চিত্র ফুটে উঠে। কিন্তু যখন তাদের বাহ্যিক আড়ম্বরতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে এর গভীরে গিয়ে প্রবেশ করা হবে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ জীবনের দিকে দৃষ্টি দেয়া হবে তখন দুনিয়ার সম্মুখে তাদের অপরিচ্ছন্নতা, অন্ধকারময় এবং পূঁতিগন্ধে পূর্ণ এক জীবন চিত্র ভেসে উঠবে।

এরূপ এক ব্যক্তি যে প্রাকৃতিক কার্যাদি সম্পাদন করার পর পানির ব্যবহার না করে ডান হাত, বাম হাতের যথেচ্ছা ব্যবহার করে সেভের কিঞ্চিৎ পানি বা নরম টিস্যু ব্যতীত তাঁর মুখে সপ্তাহে একবারও পানির স্পর্শ পড়ে না, দেহের অন্যান্য অংশও পানির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে তাঁর নখ ও বগলের নিম্নাংশের চুল কাটে না, খাবার খাওয়ার পর ব্রাশ বা কুলি না করার কারণে দাঁতে ময়লার স্তর পড়ে মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, প্রস্রাবের পর বিশেষ অংগ পরিস্কার করার জন্য সামান্য টিস্যু ব্যবহার পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় মনে করে–তাকে কি দুনিয়ার কোন চাকচিক্যময় সুন্দর পোষাক পবিত্র বানাতে পারে? হাজার ধরনের উজ্জ্বলতা কি তার অপবিত্রতাকে ঢেকে দিতে পারে? কখনোই নয়! সে ব্যক্তি কায়সার ও কিসরার মণি-মুক্তাযুক্ত অনিন্দ্য সুন্দর পোষাক পরিধান করে লন্ডন কিংবা প্যারিসের রাতকে যত সুন্দরই করুক না কেন, সে এক খন্ড সাধারণ কাপড় পরিহিত একজন মুসলমানের পদযুগল বরাবরও পবিত্রতা লাভ করতে সক্ষম নয়। কেননা একজন মুমিন মুসলমান বান্দা কেবলমাত্র তাঁর প্রভুকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যেই দৈনিক পাঁচ-ছয়বার তাঁর হাত-মুখ-পা ধৌত করে থাকে। নোংরা, অপরিস্কার ও উদ্ভট জীবন যাপন করা কোন পুণ্য নয়। আমাদের সর্বোত্তম শিক্ষক বিশ্বনবী (সা.) দেহ পবিত্র ও পরিস্কার রাখার পাশাপাশি কাপড়-চোপড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চুলে তেল দিতে এবং চিরুনী করতেও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তাআলা নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।" অতএব একজন মু'মিনের দৃষ্টান্ত এরূপ হতে হবে, সে সর্বদা পবিত্রতার উৎকৃষ্টমান নিজের মাঝে ধারণ করবে। তাই আমাদের রাসূল (সা.) এর এই পবিত্রবাণীর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি দেয়া উচিত। হুযূর (সা.) লৌকিকতা এবং বাহ্যিক চাকচিক্য অপছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা সত্ত্বেও তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ খুবই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতো। জীর্ণ-শীর্ণ এবং তালি দেয়া কাপড় পরিধান করার পরও তাঁর কাপড়ের মাঝে কোন ধরণের ময়লা পাওয়া যেত না। তিনি সর্বদা হালাল এবং পবিত্র খাবার খেতেন কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি কখনো সীমালংঘন করেন নি। স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় উজ্বল ও পরিস্কার থাকতো তাঁর মোবারক দেহ ও কাপড়-চোপড়, হুযূর (সা.)-এর পবিত্র হৃদয় সর্বদা যিকরে ইলাহীতে মশগুল ছিল। এ সকল অনন্য অসাধারণ কার্যাবলীর সন্নিবেশ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘামকে পর্যন্ত সুরভিত ও সুগন্ধময় করে দিয়েছিল। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি এমন কোন পাত্রের সন্ধান পাই নি, যেখান থেকে রাসূল (সা.) এর পবিত্র দেহ মোবারকের সুগন্ধি বের হত না।" হযরত উম্মে

সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর ঘাম উত্তম সুগন্ধিযুক্ত ছিল। আমরা আমাদের আতরের মধ্যে হুযূর (সা.) এর ঘাম মিশিয়ে নিতাম।"

কষ্ট ও পরিশ্রমী জীবন যাপন

রাসূল (সা.)-এর এরূপ পবিত্রতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনও তাঁর প্রতি দিনকার কাজে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেনি। হুযূর (সা.)-এর জীবনচরিত থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার পথে কষ্ট কিংবা পরিশ্রম কখনো অন্তরায় হতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার খাতিরে, ধূলা-বালি ও শরীর ঘর্মযুক্ত হয়ে পড়বে এই আশংকায় অথবা কাপড়ে দাগ লেখে যাওয়ার ভয়ে তটস্থ থাকে, তাকে আমরা "ঠাট বাবু" বলতে পারি। কিন্তু তাকে একজন যোগ্য মানুষ কখনো বলা যায় না। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজ জীবনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার এক মহান দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন। তিনি এতো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন আপন কার্যাবলী স্বীয় হস্তে করতেন। তিনি নিজ হাতে জুতা পরিস্কার করতেন, কাপড় সেলাই করতেন, ঘরের অন্যান্য সকল সাংসারিক কাজও করতেন। তিনি কখনো অপরিচ্ছন্ন হওয়ার বাহানায় নিজ কাজ-কর্ম কখনো পরিত্যাগ করেন নি।

হাসি-ঠাট্টা এবং আনন্দদায়ক কথাবার্তা যার মধ্যে মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই এরূপ করা অবশ্যই জায়েয। আমাদের নবী করীম (সা.) এর পূত পবিত্র জীবনে আমরা এর উদাহরণ খুজে পাই। রাসূল (সা.) স্বয়ং আনন্দদায়ক ও উৎফুল্লসূচক খোশ-গল্প করতেন। তাই সু-স্বাস্থ্যের জন্য মানুষের স্বভাবে অবশ্যই এ গুণটির আবশ্যকতা প্রয়োজন। কাঠ মোল্লার মত না হয়ে মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখা উচিত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একবার সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আপনি তো আমাদের সাথে হাসি-তামাশা, মনোরঞ্জনমূলক কথা-বার্তা বলে থাকেন। রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের সাথে সব সত্যি কথাই বলে থাকি। (তিরমিযী)

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কারো সাথে কথা বলছিলেন। এক বৃদ্ধা মহিলা এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি জান্নাতে যেতে পারব? রাসূল (সা.) তাকে বললেন, কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ কথা শুনামাত্র বৃদ্ধা মহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। তখন রাসূল (সা.) মুচকি হেসে বললেন, আমার এ কথা বলার তো এই অর্থ ছিল–আল্লাহ্ তাআলা কাউকে বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে বলেন, "আমরা নারীদেরকে জান্নাতে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব এবং তাদের সকলকে কুমারী যুবতী বানিয়ে দিব।"

ব্যায়াম, ভ্রমণ ও বিনোদন

ব্যায়াম, ভ্রমণ ও বিনোদন মানব জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। ব্যায়ামের তারতম্য এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। একবার হযরত রাসূল করীম (সা.) হযরত আয়শা (রা.) এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) থেকেও এটা প্রমাণিত যে, একবার তিনি ইসলামের প্রতি আত্মাভিমান ও গায়রতের খাতিরে এক শিখ ব্যক্তিকে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছিলেন। যার ফলে সে শিখ ব্যক্তির মিথ্য অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে আঁ হযরত (সা.) সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য মুগুর চালাতেন এটাও প্রমাণিত সত্য। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) অনেক সময় কাদিয়ান থেকে শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। একবার তিনি বিপাশা নদীর তীরে নিজ সন্তান ও খোদ্দামদের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপরোক্ত কথাগুলির ওপর চিন্তা করে যদি একজন মানুষ এর ওপর আমল করা শুরু করে তাহলে নিশ্চিত সে গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয় দিকের সৌন্দর্য ও কল্যাণ দ্বারা উপকৃত হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন– ব্যায়ামের অভ্যাস এই জন্য করা উচিত, যেন মানুষের শরীরে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, মনে আনন্দ ফূর্তির সৃষ্টি হয়। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সতেজ, সবল থাকে এবং হৃদয়ে সাহস জন্মায়।" (আল ফযল, ২৮ মার্চ, ১৯৩৯ পৃ: ২)

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন তাঁর চেহারার ওপর এক পবিত্র নূরের প্রভা তৈরী করেছিল। ঐশী নূর যার ওপর বিকশিত হয়ে এক নতুন জগতের উদ্ভব করেছিল। সাহাবা (রা.) কখনো পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাতেন আবার কখনো নবী (সা.)-এর চেহারার দিকে দৃষ্টি দিতেন এবং তারা নি:সংকোচে বলতেন, এই নূর নি:সন্দেহে চাঁদের চেয়েও আলোকজ্জ্বল ও দৃষ্টিনন্দন। তাঁরা রাসূল (সা.)কে সূর্যের সাথে তুলনা করতো কিন্তু সেই সাথে এটাও বলত, এই জ্যোতি সকল জ্যোতি চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) এর চেয়ে উত্তম ও সুন্দর কিছু পৃথিবীতে আর দেখি নি। রাসূল (সা.) এর চেহারা মোবারক দীপ্তমান সূর্য ছিল। আমি হুযূর (সা.) এর চেয়ে অধিক দ্রুতগতিসম্পন্ন অন্য কাউকে পাই নি। রাসূল (সা.) এমনভাবে হাঁটতেন, মনে হত মাটি তাঁর পায়ের তলায় পিষ্ট হচ্ছে। আমরা তাঁর সাথে চলার জন্য হাঁটতাম কিন্তু আমরা তাঁর সাথে পেরে উঠতাম না। এখানে বলা দরকার হুযূর (সা.) এর চলনের মাঝে কোন অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যতার লেশ ছিল না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শুধুমাত্র ইবাদতের ক্ষেত্রেই সকল মানুষের চেয়ে অগ্রসরমান ছিলেন না বরং ভয়ানক ও বিপদসংকুল সময়ে যেখানে সাহসীকতা, বীরত্ব, পুরুষত্ব মানুষকে উদ্বেলিত করে, সে সকল স্থানে সকলের চেয়ে সর্বাধিক

একবার তিনি মসজিদে দরস দিচ্ছিলেন, কেউ একজন এসে বললো, অমুকে দালানের ওপর থেকে পড়ে গেছে! একথা শুনে তিনি এতো জোরে আর্তচিৎকার করলেন যে উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেল। তিনি হন্তদন্ত খালি পায়েই ছুটলেন সেই লোকের বাড়ির দিকে। অনেক সহানুভূতি ও সমবেদনা জানিয়ে সাধ্যমত সেবা-শুশ্রুষা করে পরে ফিরে এলেন। এরপর থেকে প্রতিদিন সকালে এই কাজ জারী থাকল যতদিন না রোগী ভাল হয়েছে। (রঈস আহমদ জাফরী রচিত চার ইমামের জীবন কথা)। এমন উন্নততর হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। অথচ নিজের ওপর কোন বিপদ এলে তা এমন নীরবে একা একাই সয়ে যেতেন যে, মানুষ তা দেখে বিস্মিত হত।

শাসকগোষ্ঠী ও তার পাইক-পেয়াদা কতভাবে কত রকম তাঁকে কষ্ট দিয়েছে যার হিসেব নাই। কিন্তু তিনি কোনভাবেই তাঁর মর্যাদার মাথাটিকে নত করতে পারেনি। পারেনি তাঁকে তারা তাদের দরবারী মোল্লা বানাতে। পরচর্চা, পরনিন্দা তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তিনি সব সময় মহান আল্লাহর শোকর আদায় করে বলতেন, আল্লাহতায়ালা আমার মুখটাকে এই ভ্রষ্টাচার থেকে মুক্ত রেখেছেন। একজন তাঁকে বলেছিলেন- জনাব, লোকেরা আপনার সম্পর্কে কত কিছু বলে! অথচ আপনার মুখ থেকে তাদের সম্পর্কে কোনদিন কিছু শুনলাম না, এর উত্তরে তিনি বললেন- 'এটা আল্লাহতায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান শুধু তাকেই দান করেন।'

জানা যায়, তিনি কোন দিন কারো সম্পর্কে গীবত করেননি। আকাশের মত উদার হৃদয়, পর্বতের মত সিদ্ধান্তে অটল-অবিচল এবং আত্মনির্ভরশীলতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। মহান আল্লাহতায়ালা জান্নাতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আমীন।

মাহমুদ আহমদ সুমন

নবীনদের পাতা

প্রত্যহ কুরআন করীম পাঠের গুরুত্ব

মহান খোদা তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন "আল্লাহু নাজ্জালা আহ্সানাল হাদীসি কিতাবাম মুতাশাবিহাম মাছানি, তাক্শা ইররু মিনহু জুলুদুল্লাযিনা ইয়াখশাউনা রাব্বাহুম" (সূরা আয যুমার আয়াত নং ২৪)। অর্থাৎ আল্লাহ কিতাবরূপে সর্বোত্তম বাণী নাযেল করেছেন, যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠনীয়। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, পৃথিবীতে যত কিতাব রয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আল কুরআন। আর কুরআন নিজেই দাবী করছে যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযেল করা হয়েছে এবং এ কিতাব বার বার পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। কুরআন ছাড়া অন্য কোন বই বা কিতাব পৃথিবীতে এমন নাই যে নিজে এমন দাবী করতে পারে। তওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ইত্যাদি ঐশী কিতাব হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি ঠিকই কিন্তু এসব কিতাবে একথা ঘোষণা দেয়া হয়নি যে এটি আল্লাহর কিতাব।

পবিত্র কুরআন যেভাবে আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে হজরত রাসূল করিম (সা.)এর ওপর নাযিল হয়েছিল আজও অবিকল তেমনই রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে আর এর সংরক্ষণকারী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজে। আমরা অনেক বড় সৌভাগ্যবান কারণ এমন মহান এক ঐশী কিতাবের অনুসারী আমরা।

আমরা যদি এর মূল্যায়ন না করি তাহলে এটা হবে আমাদের দুর্ভাগ্য। পবিত্র কুরআন পাঠের অনেক ফযিলত ও গুরুত্ব রয়েছে। কুরআন শুধু যে তোতা পাখির ন্যায় পরে যাব তা কিন্তু নয়, পড়তে হবে ধীরে ধীরে, যত্নসহকারে সঠিক উচ্চারণ এবং সুন্দর ভাবে। যেভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে " ওয়া রাত্তিলিল কুরআনা তারতিলা" অর্থাৎ এবং তরতীল সহকারে সুললিলত কণ্ঠে কুরআন আবৃতি কর।

হযরত রাসূল করীম (সা.) পবিত্র কুরআন পাঠের গুরুত্ব বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন ' কুরআন পাঠ কর, কেননা বিচার দিবসে কুরআন পাঠকের শাফায়াতকারী হবে' (মুসলিম)। তিনি আরও বলেছেন যে কুরআন শরীফের একটি শব্দ পাঠ করবে তার জন্য দশটি করে নেকী রয়েছে। তিনি (সা.) আরও বলেন, 'যে পেটে কুরআনের কিছুই নেই তা খালি ঘর তুল্য' (তিরমিযী)।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন ' তোমরা কুরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর এবং এর সাথে এরূপ প্রণয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর যা অন্য কারও সাথে করো না। কারণ আল্লাহ তাআলা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, সর্ব প্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফেই নিহিত আছে। এ কথাই সত্য। ধিক্ ঐসকল ব্যক্তিকে যারা কুরআন শরীফের উপর অন্যকোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআন শরীফে আছে' (কিশতিয়ে নূহ)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, 'যদি এই কিতাবে ঐসব সরঞ্জাম নিহিত থাকে যা প্রত্যেক পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে কুরআন শরীফ অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআন প্রতিটি যুগের প্রয়োজন পুরাপুরি সরবরাহ করে থাকে। .....বস্তুত কুরআন শরীফের যে সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তথ্য, ঐশী জ্ঞান বৃদ্ধি করে তা সর্বদা প্রয়োজন অনুসারে প্রকাশিত হয় এবং নতুন নতুন জটিলতার সময় তার নতুন মহাজ্ঞান পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে' (ইযালায়ে আওহাম)।

প্রত্যেহ কুরআন পাঠ করা অনেক কল্যানের কারণ। পবিত্র কুরআন যদি আমরা নিয়মিত পাঠ করি তাহলে আমাদের জীবন হবে অনেক বেশী আনন্দময় এবং জ্ঞানের পরিধি কত যে ব্যাপক হবে তা বলা মুশকিল, কারণ সকল প্রকারের জ্ঞানতো এই ঐশী গ্রন্থেই রয়েছে। মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন বেশী বেশী পাঠ করার মনমানষিকতা তৈরী করে দিক এবং আমরা যেন নিয়মিত পাঠ করতে পারি সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান সাহেবের স্বাগত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুরের দ্বিতীয় সালানা জলসা ২০১০ এর শুভ উদ্বোধন এবং সফলতার সাথে জলসা সম্পন্ন।

মহান খোদা তাআলার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুরের দ্বিতীয় সালানা জলসা গত ১৩ মার্চ ২০১০ মিরপুর ১০নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টারে দ্বিতীয়বারের ন্যায় মসজিদের বাইরে অত্যন্ত আনন্দঘন কোলাহল মুক্ত ও পরিপূর্ণ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে দোয়ার মাধ্যমে সকাল ৯-৩০ মি: জলসার ১ম অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা করেন

জনাব কোরাইশী মোহাম্মদ সাদেক। উদ্বোধনী ভাষন প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জলসার ইতিহাস তুলে ধরেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যেন উত্তম ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষা দান করা হয় সে বিষয়ে সকলকে অবগত করেন। তিনি আরো বলেন, শিশুদেরকে যেন ছোট বেলা থেকেই জামা'তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা হয়, যার ফলে বড় হয়ে তারা জামা'তী কাজকর্মে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে।

এরপর সুললিত কণ্ঠে উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব কাজী মোবাশ্বের। নযম শেষে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম বি, আকরাম আহমদ খান চৌধুরী, আমীর-আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর। তিনি তার স্বাগত ভাষণে সকলকে তবলীগের কাজে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খিলাফতে আসিন হওয়ার পর বাংলাদেশে আসার জন্য আশা ব্যক্ত করেছিলেন কিন্তু আমরা তাঁকে আনতে পারি নাই। বর্তমান খলীফাও বাংলাদেশে আসার জন্য আশা রাখেন তাই যুগ খলীফার পদধূলিতে বাংলার মাটি যেন ধন্য হয় সেই ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে। এইজন্য সকলকে বেশী বেশী তবলীগের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। শেষে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রদত্ত জলসা সালানার দোয়া পাঠ করে শুনান।

এরপর বক্তৃতা পর্বে *সকল কল্যাণের আধার পবিত্র কুরআন* বিষয়ে মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের মোয়াল্লেম, খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার বক্তব্যের একাংশে বলেন, সূরা বাকারার শুরুতেই এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ যার মাঝে কোন ভুল ত্রুটি নেই সকল ভুল থেকে এটি মুক্ত। পৃথিবীতে যত বড়

বড় লেখক রয়েছেন তাদের রচিত বই পুস্তক সম্পর্কে তারা কেউ এই দাবী করতে পারে না যে তাদের পুস্তকে কোন ভুল নেই। তিনি তার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআনের হেফাযতের দায়িত্বসহ বিভিন্ন

আয়াত উপস্থাপন করেন।

এরপর *নেযামে ওসীয়্যত* সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট আব্দুস সামাদ। তিনি তার বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে এবং সম্প্রতি বিশ্বের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে খুব সুন্দর ও সহজভাবে ওসীয়্যতের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, হযরত

মসীহ্ মাওউদ (আ.) নেযামে ওসীয়্যতের মাধ্যমে এমন নেযাম কায়েম করেছেন যার ফলে সারা বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কোন সদস্য ভিক্ষাভিত্তি করে না। দারিদ্রবিমোচনে আহমদীয়া জামা'ত সর্বত্রে কাজ করে যাচ্ছে। আহমদীয়া জামা'তের সকল সদস্যরা ভলান্টিয়ার সার্ভিস দেয় ফলে যা আয় হয় তাই মানবতার সেবায় ব্যয় হয়। যতদিন পর্যন্ত বিশ্বের সকল মানুষ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পতাকা তলে না আসবে ততদিন বিশ্ব থেকে দারিদ্রবিমোচন সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে বাংলা নযম পাঠ করেন ইব্রায়েত হাসান পুলক।

এরপর *নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য* বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতার একাংশে বলেন, অতীতে নারী জাতির কোন মূল্য ছিল না যেমন–মনুর মতে নারী দিবারাত্রি অবশ্যই পুরুষের করা শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ নারী জন্মগত ভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপদগামী হবে। এই ধরনের জঘন্য মনোভাব তৎকালীন সমাজে প্রচলন ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এবং বর্তমান যুগেও নারী সীমাহীন অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন। তিনি তার বক্তৃতায় ইসলাম নারীদের কি মর্যাদায় ভূষিত করেছেন তা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। তার বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

জলসার দ্বিতীয় ও সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় মোহতরম মীর মোবাশ্বের আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে বিকাল ৩ টায়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন জনাব আতাউর রহমান। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব কাশেম হুসাইন পিয়াস।

বক্তৃতা পর্বে *হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ* প্রসঙ্গে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতার একাংশে বলেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) এমন সত্তা যাঁকে সৃষ্টি না করলে খোদা তাআলা এই পৃথিবীই সৃষ্টি করতেন না। নবী করীম (সা.) এমন এক মহান ব্যক্তিসত্তা ছিলেন যাঁকে সবাই ভালবাসতো কেউ তাঁকে ভয় করতো না আর তিনি কখনো কারো সাথে রাগান্বিত হয়ে ব্যবহার করেন নি। আমরা যদি শ্রেষ্ঠ রাসূলের আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করি তাহলে অবশ্যই আমরা খোদা তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারবো। রাসূল করীম (সা.) এর ভালবাসা ছাড়া আজ কোন ভাবেই খোদা তাআলাকে লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি শেষে বলেন, যারা ইতিপূর্বে মুসলমানদের ওপর যুলুম অত্যাচার নির্যাতন করেছে তাদেরকে পর্যন্ত খাতামান্নাবীঈন (সা.) ক্ষমা করে দিয়ে পৃথিবীতে ক্ষমার উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করেছেন এবং তিনি (সা.) সবাইকে নবজীবন দান করেছেন। আল্লাহ্

তাআলা আমাদেরকে সেই মহান রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন।

এরপর যিকরুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার যিকির বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুবাশ্বের মুরব্বী। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, নামায হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করার সর্বোত্তম যিকির। এই বক্তৃতার পর না'তে রাসূল সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে শুনান জনাব এনামুল হক রাসেল। এরপর *প্রতিশ্রুত মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)* সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মওলানা

বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্। তিনি তার বক্তৃতায় কুরআন হাদীসের

আলোকে প্রমাণ করেন মূসায়ী ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মুহাম্মদী ঈসা ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করে ১৯০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বলেন, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে অনেক আলেমগণ এই কথা স্বীকার করেছে যে, ইসলামের বিশ্ব বিজয় ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমেই হবে।

আর আজ সারা বিশ্বে ১৯৭ টি দেশে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে লাখো লাখো বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ভাজন হচ্ছেন। যারা এখনো ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারছেন না তাদেরকেও তিনি আহ্বান জানান ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা যাচাই করে তাঁর হাতে বয়আত করা। এই বক্তৃতার পর অফিসার জলসা কমিটি জনাব সৈয়দ আব্দুল হান্নান শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। শেষে সভাপতি সাহেব *খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা ও এর কল্যাণ* প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তৃতায় খিলাফতের আনুগত্য সর্বাবস্থায় জরুরী এ বিষয়ে সকলকে অবগত করেন। তিনি আরো বলেন, খলীফার সব আদেশ কল্যাণকর হয় তেমনিভাবে আমীর সাহেব যা বলেন, তাও কল্যাণকর। আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসে দেখা যায় যারা বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের মূলে ছিল খলীফার আনুগত্য। তিনি প্রফেসার আব্দুস সালাম সাহেব ও চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের খিলাফতের আনুগত্যের কথা তুলে ধরেন। দেখা যায় যারাই নেযামের আনুগত্য করেছেন তারা প্রত্যেকেই উন্নতি করেছেন অপর পক্ষে যারা আনুগত্য করেন নি তারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়েছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র ফযলে আহমদীয়া জামা'তের চারজন খলীফার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমাদের উচিত, আমরা যেন সব সময় নেযামের পরিপূর্ণ আনুগত্য করি। এরপর দুই জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে শামিল হন। সভাপতি সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

মিরপুরের দ্বিতীয় সালানা জলসার সমাপ্তি ঘটে। এতে ৮৫০ জন সদস্য সদস্যা অংশগ্রহণ করেন এবং জেরে তবলীগ ছিলেন ৮৯ জন। জলসায় আগত মেহমানদের সুবিধার্থে ২টি বাসের ব্যবস্থাও ছিল। জলসার অনুষ্ঠান এমটিএ-এর ক্যামেরার মাধ্যমে লাজনাদের জলসাগাহে সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা ছিল।

ছবি ও লেখা– মাহমুদ আহমদ সুমন

অত্যন্ত শান শওকত ও সফলতার সাথে তারুয়ার ৬৬তম সালানা জলসা-২০১০ অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তারুয়ার ৬৬তম সালানা জলসা গত ৫ ও ৬ মার্চ ২০১০ স্থানীয় মসজিদ 'মসজিদে বাশারত' প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। ৫ শুক্রবার (বাদ জুমুআ) বিকাল ৩ টায় জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মীর মোবাশ্বের আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১। অধিবেশনের শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মারুফ আহমদ। এরপর সভাপতি সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব এস, এম, ইরফান। এরপর সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে তবলীগ করতে হবে নিজেদের ভাল কাজকর্ম প্রদর্শন করে ও উত্তম ব্যবহার দিয়ে। এ অঞ্চলের মানুষ সৌভাগ্যবান যে তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জামা'তভুক্ত হয়েছে। তাই একাজ আমাদের জন্য জরুরী। সকলকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাক দেওয়ার এবং তবলীগ করার আহ্বান জানান। এরপর জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কেন শ্রেষ্ঠ? তা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) প্রণীত পুস্তক এবং বিভিন্ন পুস্তক থেকে তুলে ধরেন।

এরপর মওলানা মোহাম্মদ সুলায়মান নেযামে খিলাফত ও এর আনুগত্য বিষয়ে খিলাফত কি? ও এর আনুগত্য এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতের আলোকে উপস্থাপনা করেন। এরপর একটি বাংলা নযম (শহীদী গজল) আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান পরিবেশন করেন। এ অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন জনাব মওলানা নওশাদ আহমদ, তার বক্তব্যের বিষয় ছিল হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব। তিনি এ বক্তব্যে এলাকার মানুষকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর বয়আত গ্রহণ করতে আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে মাগরিব ও এশা নামায জমা হয়। সন্ধ্যা ৭ টায় এমটিএ-তে হুযূর (আই.)-এর প্রদত্ত জুমুআর খুতবা Live দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। অত্যন্ত আগ্রহভরে সবাই TV-তে খুতবা শুনেন। খুতবা শেষে তবলীগি সভা হয় এতে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে ২৫/৩০ জন জেরে তবলীগ মেহমান উপস্থিত ছিলেন, সভাশেষে একজন বয়আত গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করেন।

৬ মার্চ সকাল ১০ ঘটিকায় দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় জনাব মোহাম্মদ শামসু মিয়া, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব-এর সভাপতিত্বে। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জুয়েল আহমদ। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব সোপান আহমদ। এরপর মওলানা জহির উদ্দীন আহমদ মুবাশ্বের মুরব্বী সময়ের আহ্বান "মালী কুরবানী ও ওসীয়্যত ব্যবস্থা" বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রোতাদের ওসীয়্যত করার জন্য তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এরপর জনাব মৌ. এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম, ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মুসলিম নারীর অবদান সম্বন্ধে প্রাথমিক যুগের ও বর্তমান যুগের নারীর ভূমিকা ও অবদানের কথা উল্লেখ করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ অধিবেশনের শেষে একটি প্রশ্নত্তোর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় আর উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, বাংলাদেশ। প্রশ্ন উত্তর পর্বে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্য থেকে সরাসরি ও লিখিত প্রশ্ন করেন এবং সরাসরি এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

বিকাল ৩ ঘটিকার সময় সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব আব্দুল ওয়াহেদ। 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন' এ বিষয়ে কুরআন হাদীসের আলোকে যুক্তি প্রমাণ ও প্রশ্ন উত্তর মালার অবতারনা করে প্রাণবন্ত বক্তব্য পেশ করেন জনাব মওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মুবাশ্বের মুরব্বী। সর্বশেষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ বাংলাদেশ, তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল ইসলাম ধর্মের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য। এ বিষয়ে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা কুরআন মজীদ ও রাসূল করীম (সা.) এর সিরাত থেকে তিনি পেশ করেন। সভাপতি সাহেব সভার সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ করেন। এর পূর্বে দোয়ার এলান পড়ে শুনানো হয়। উল্লেখ্য যে এ জলসায় রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ এর হিসাব অনুযায়ী সর্বমোট ১৬৮০ জন অংশগ্রহণ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র দোয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এ জলসার প্রতিটি অনুষ্ঠান MTA ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে এবং মহিলাদের জলসাগাহে তা সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা ছিল।

জহির আহমদ মিয়াজী

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয় কয়েকটি জামা'তের সংবাদ নিম্নে পরিবেশন করা হল

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, অম্বরনগরে 'সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা-২০১০ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ তাআলার অশেষ ফজলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, অম্বরনগর, নোয়াখালীর উদ্যোগে আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা-২০১০ গত ১৭ মার্চ, বুধবার সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ আলা যালেক। কেন্দ্র থেকে মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর মওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩ ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ জনাব মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ মোহাম্মদ আবদুল জলিল জলসায় যোগদান করেন।

দিনব্যাপী জলসা বিকাল ৩ ঘটিকা হতে শুরু হয়ে রাত ১০ঃ০০টা পর্যন্ত চলে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের আমীর মোহতরম মাহমুদ হাসান সিরাজীর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন থেকে তেলোয়াত করেন জনাব আবুল কাশেম, উর্দূ নযম পাঠ করে শুনান মর্তুজা আহমদ তানবীর, সভাপতির উদ্বোধনী বক্তৃতা ও দোয়ার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন অম্বর নগর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুর্শেদ আলম চৌধুরী 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর অংশ বিশেষ' আলোচনা করেন মুবাশ্বের মুরব্বী মওলানা রবিউল ইসলাম, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চিরস্থায়ী কল্যাণধারা ইসলামী খিলাফতের বরকত' বিষয়ে মোহাম্মদ আবদুল জলিল, জনাব ইনামুল হক ইন্টু মরহুম ছলিমুল্লাহ সাহেবের লিখিত 'ঈদে মিলাদুন্নবী' নযম পাঠ করে শুনান। 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা-মানব খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)' বিষয়ে মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী আলোচনা করেন। বক্তৃতা পর্বের পর প্রশ্নোত্তর আলোচনা শুরু হয়।

মাগরিবের নামাযের পর জনাব হেলালউদ্দিন আহমদের নযম পাঠের পর পুনরায় প্রশ্নোত্তর আলোচনা শুরু হয়। জলসায় আগত জেরে তবলীগ বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী। জলসা শেষে একজন বয়আত গ্রহণ করেন। জলসায় আটটি জামাত হতে ১৫০ জন পুরুষ মহিলা এবং ৫০ জনের অধিক জেরে তবলীগ মেহমান যোগদান করেন। আল্লাহ তাআলা যেন এ অঞ্চলে প্রকৃত ইসলাম এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সত্যতা বিকশিত হয় সেজন্যে সকলের খিদমতে খাস দোয়ার আবেদন।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

উথলী

গত ০৫/০৩/২০১০ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলী মসজিদ প্রাঙ্গনে জনাব ডাঃ মোহাম্মদ সামসুল হক মিয়া প্রেসিডেন্ট উথলী এর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে "সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা" অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বক্তৃতা পর্বে গোলাম ও দাসদের সাথে আঁ হযরত (সা.) এর আচরণ নিয়ে বক্তৃতা করেন জনাব তাহের খালিদ রুমি। আঁ হযরত (সা.) এর বিভিন্ন গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেন জনাব শরীফ উদ্দিন আহমদ। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর দৃষ্টিতে আঁ হযরত (সা.) এর মাকাম নিয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোয়যযেম আহমদ সানী। মাকামে মাহমুদ নিয়ে বক্তৃতা করেন জনাব আব্দুল গফুর । হযরত নবী করীম (সা.)-এর আদর্শাবলী নিয়ে বক্তৃতা করেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু স্থানীয় মোয়াল্লেম। আঁ হযরত (সা.)-এর মক্কা ও মদীনার জীবন আদর্শ নিয়ে সভাপতি সাহেব বক্তৃতা করেন এবং তার দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুয়াযযেম আহমদ সানী

নাখালপাড়া

গত ১২/০৩/১০ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসজিদ বায়তুল হাদী, নাখালপাড়ায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়,

আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব শফিকুল হাকীম আহমদ, কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আজিজুল হক। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ কামরুল আহসান, প্রেসিডেন্ট নাখালপাড়া হালকা। বাংলা নযম পরিবেশন করেন আতাহার আহমদ সোহাগ। বক্তৃতা পর্বে সীরাতুন্নবী (সা.) এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন আহমদ তৌসিফ চৌধুরী। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত ও পূর্ববর্তী জীবন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন গোলাম মুর্তজা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র বিশ্বের নবী এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ শামস উদ্ দ্বিন ভুইয়া। ইসলাম প্রচারে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন। পরিশেষে কায়েদ সাহেব শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে খোদ্দাম, আতফাল, আনসার, লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শফিকুল হাকীম আহমদ

রংপুর

গত ২৭/০২/২০১০ রোজ শনিবার বাদ নামায আসর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রংপুরের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, জেনারেল সেক্রেটারী উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করেন মোয়াল্লেম মৌ. জাকির হোসেন এবং দোয়ার পর নযম পাঠ করেন নাসেরাত আশরাফুন্নেছা জোস্না। পরে উক্ত দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন বক্তাগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। শেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জেনারেল সেক্রেটারী

ফতুল্লা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফতুল্লার শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ 'মসজিদ নূর'-এ গত ১৭ ফেব্রুয়ারী-২০১০ মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত মহতী জলসা উল্লেখিত দিনে বাদ আসর আরম্ভ হয়। এ বছর বাংলাদেশের ৮৬তম সালানা জলসায় আগত হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব বুরহানুল হক সাহেব ও উর্দ্দু নযম পাঠ করেন জনাব তাহের রহমান শুভ। এরপর জলসার আলোচনা পর্ব আরম্ভ হয়। সর্ব প্রথম শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফতুল্লা জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব কামাল পাশা সাহেব। এরপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন মোহতরম মওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব আমীর বাংলাদেশ। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরমত সহিষ্ণুতা। এই বক্তৃতা চলার মাঝেই বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান সাহেব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং তাঁর যোগদানে জলসা নতুন মাত্রা পায়। এরপর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি সাহেব মাগরিব ও এশার নামায জমা পড়ান। নামাযের পর সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব, অদ্যকার সভার সভাপতি ও হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি। তিনি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর পবিত্র জীবনাদর্শের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন এবং উপস্থিত সবাইকে উজ্জীবিত করেন। এই জলসায় ৫ জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ সর্বমোট ১২৫ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সাহেবের ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন

সারাদেশে আহমদীয়াতের সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন ঐতিহাসিক মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয় নিম্নে সংবাদ পরিবেশিত হলো

নারায়ণগঞ্জ

গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১০ইং রোজ শনিবার বিকাল ৩-৩০ মিনিটে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় আমীর মোহতরম এডভোকেট তাইজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পেশ করেন মোহতরম মারুফ আহমদ সাগর। উর্দু নযম আবৃতি করেন মোহতরম সাইফুল আহমদ বিপুল। সভায় মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর মহান চরিত্র ও কৃতিত্ব, ২০ ফেব্রুয়ারীর শিক্ষা ও আমাদের করণীয়, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবন চরিত, মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ঐশী প্রতিশ্রুতি ও কর্মময় জীবনে তার পূর্ণতা, মুসলেহ্ মাওউদ দিবস এর তাৎপর্য তুলে ধরতে আমাদের দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ের ওপর তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন সর্বজনাব নাজমুল আলম, ফজল মাহমুদ, ডা. মোজাফফর উদ্দিন আহমদ, আহমদ আলী, মঈন উদ্দিন আহমদ, রফি উদ্দিন আহমদ, শেষে সভাপতির ভাষণে তিনি মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে ইসলাম ও আহমদীয়াতের একনিষ্ঠ সেবক হওয়ার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি সহ শতাধিক দর্শক শ্রোতা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ

করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

রফি উদ্দিন আহমদ

আশুলিয়া

আল্লাহ তাআলার ফজলে গত ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আশুলিয়ায় 'মুসলেহ মাওউদ' দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে । পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠের পর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ আল্ মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনীর ওপর আলোচনা করেন জনাব নজরুল ইসলাম, জনাব মসিউর রহমান ও মোহাম্মদ আবদুল জলিল । এরপর সভাপতি জনাব কামাল পাশা সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার পর সভা শেষ হয় । আলোচনা সভায় পুরুষ মহিলা ও শিশুসহ প্রায় ২০জন উপস্থিত ছিলেন ।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

তেবাড়িয়া

গত ২০/০২/১০ তারিখ বাদ আসর তেবাড়িয়া জামা'তের উদ্যোগে অত্যন্ত ধর্মীয় পরিবেশে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মহসীন আলী রেজা সাহেবের সভাপতিত্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য ও তাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন মওলানা খোরশেদ আলম মোবাশ্বের মুরব্বী, জনাব হামজা আমীর ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। পরিশেষে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত দিবসে মোট ৯৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ ইশতিয়াক আহমদ জেসিন

বগুড়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বগুড়ার উদ্যোগে গত ২১/০২/১০ইং বাদ আসর হতে এশা পর্যন্ত মহান মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আজমল হক প্রেসিডেন্ট। শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুস সালাম, নযম পাঠ করেন জনাব হাসিবুল হক ও ফেনিস, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, জনাব আব্দুস সালাম, জনাব আবুল কালাম আজাদ, জনাব অধ্যাপক রাজিব উদ্দিন আহমদ, শেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে মোট ২৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

কটিয়াদি

গত ২৬/০২/২০১০ শুক্রবার বাদ জুমুআ কটিয়াদি মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এম, এ, হান্নান সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন শাকিল আহমদ, নযম পরিবেশন করেন আব্দুল হামিদ ভূইয়া, বক্তৃতা করেন সর্বজনাব খলিল আহমদ, নজরুল ইসলাম, ডা: রুহুল আমীন, মৌ. বশির আহমদ, ডা: খালেদ আহমদ, ডা: শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এম, এ, হান্নান

ঘাটুরা

গত ২০/০২/২০১০ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন এস, এম, আরমান, উর্দু নযম পাঠ করেন নাসের আহমদ (দোলন)। এতে পর্যায়ক্রমে দিবসের পটভূমি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. আসাদ উল্লাহ্ আসাদ, জনাব এস, এম, রহমতুল্লাহ, জনাব মজিবর রহমান লস্কর, জনাব মকবুল আহমদ। বাংলা নযম পাঠ করেন, জনাব সজল আহমদ, সবশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৯২ জন সদস্য ও সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

উজ্জ্বল আহমদ

ঢাকা

গত ২৬/০২/২০১০ শুক্রবার বাদ জুমুআ দারুত তবলীগ মসজিদে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে বিভিন্ন বক্তাগণ ইসলাম প্রচারে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর অসাধারণ কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এতে খোদ্দাম আতফালসহ মোট ১৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সফিকুল হাকীম আহমদ

ধানীখোলা

গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ধানীখোলায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও শান শওকতের সাথে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব এডভোকেট মঞ্জুর আনাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠের পর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মুস্তাফিজুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন পাটওয়ারী, মৌ. এস, এম, আব্দুল হক। শেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে জামা'তের উল্লেখ সংখ্যক সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

তোফাজ্জল হোসেন পাটওয়ারী

চরসিন্দুর

গত ২৬/০২/২০১০ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চরসিন্দুর এর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। জনাব

আফজাল আহমদ ভূঁইয়া, জেনারেল সেক্রেটারী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চরসিন্দুর-এর সভাপতিত্বে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব শাকিল আহমদ, নযম পাঠ করেন তাহের আহমদ (প্রান্ত)। এরপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। এতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন মৌ. এ, কে, আনসারী, যয়ীম আনসারুল্লাহ্ চরসিন্দুর এবং নাছের মাহমুদ কবির, কায়েদ–খোদ্দামুল আহমদীয়া, চরসিন্দুর। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পূর্ণতা এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক। এরপর সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়া এবং উপস্থিত সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে চরসিন্দুরের চারটি হালকার সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

আফজাল আহমদ ভূঁইয়া

উথলী

গত ২৬/০২/২০১০ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলী মসজিদ প্রাঙ্গনে জনাব ডা: মোহাম্মদ সামসুল হক মিয়া প্রেসিডেন্ট উথলী এর সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আবুল হায়াত মিয়া। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এর আলোকে বক্তৃতা করেন জনাব রাজিব মাহমুদ চৌধুরী। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক ঐশী নিদর্শন এর ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব আব্দুল গফুর । হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) রচিত সবুজ ইশতেহার ও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক মহান খলীফা এবং তাঁর কর্মকান্ড নিয়ে বক্তৃতা করে মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু। সভাপতি সাহেব ও তার সমাপনি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোয়ায্যেম আহমদ সানী

খুলনা

গত ২৬/০২/২০১০ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার উদ্যোগে মোহতরম আমীর জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এর সভাপতিত্বে বায়তুর রহমান মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ পল্লব এবং নযম পাঠ করেন জনাব মসিউল আলম খান। অত:পর মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পূর্ণতা এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ শামসুর রহমান এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. শাহ আলম খান। সবশেষে সভাপতি সাহেব হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর খিলাফতকালীন সময়ের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর দিকনির্দেশনার কথা স্মরণ করে সে মোতাবেক সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সর্বমোট ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

জি, এম, মুশফিকুর রহমান

রংপুর

গত ২০/০২/২০১০ রোজ শনিবার বাদ আছর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রংপুরের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, জেনারেল সেক্রেটারী উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তাগণ আলোচনা করেন।

মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ

ফতুল্লা

গত ২১ ফেব্রুয়ারী ১০ইং রোজ রবিবার মাগরিব ও এশার নামায জমার পর ফতুল্লা জামা'তের মসজিদ নূরে মুসলেহ মাওউদ দিবস অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যভাবে পালন করা হয়, (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত অনষ্ঠান মোহতরম কামাল পাশা প্রেসিডেন্ট ফতুল্লা জামা'তের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ডা: আবু নাসির ও নযম পাঠ করেন তাহের রহমান শুভ।

আলোচনা পর্বে প্রবন্ধ পাঠ করেন–সর্বজনাব নূর আহমদ বিপ্লব, কায়েদ ফতুল্লা। মুসলেহ্ মাওউদ ও খিলাফত প্রসঙ্গে শাহ বাহাউদ্দিন শিবলী। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের পটভূমি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন কাজী মোবাশ্বের আহমদ। উর্দু নযম পাঠ করেন মাসুদ আহমদ মামুন। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করেন আব্দুল কাদির। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য ও মাতৃভূমি প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত দিবসে ২ জন মেহমানসহ মোট ৫৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

লাজনা ইমাইল্লাহ্–নারায়ণগঞ্জ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যেগে গত ২৬-০২-২০১০ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মুসলেহ্ মাওউদ দিবস সফলতার সাথে উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম (মায়া) এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও তরজমাসহ পাঠ করেন ফাতেমা নজরুল, উর্দু ও বাংলা নযম আবৃত্তি করেন তাহমিনা ফয়েজ ও বুশরা আক্তার। অত:পর বক্তৃতা পর্বে উম্মে কুলসুম চায়না হযরত মির্যা বশির উদ্দীন

মাহমুদ আহমদ (রা.) এর জীবন চরিত ও কৃতিত্ব সম্পর্কে, মাসুদা পারভেজ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে, জুয়েল বেগম দীবা ২০ ফেব্রুয়ারীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে, ফাতেমা মনোয়ার মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সবশেষে সভানেত্রীর ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৬ জন লাজনা ও ২০ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে উপস্থিত সবাইকে বিশেষ আপ্যায়নের মাধ্যমে আপ্যায়িত করা হয়।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ্–চট্টগ্রাম

গত ৫ মার্চ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়। তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মিসেস বিলকিস বেগম। এরপর হাদীস পাঠ করেন উজমি কমল। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) রচিত নযম পরিবেশন করেন হেবাতুন নূর। দিবসটির তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন মিসেস নাঈমা বুশরা। মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পড়ে শুনান নাসেরাত বোন কাসফিয়া তাসনীম। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করেন তাহেরা মজিদ। সর্বশেষ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) রচিত হিজরী শামসী বছর নিয়ে আলোচনা করেন মিসেস রওশনারা আহমদ, লাজনা প্রেসিডেন্ট। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবা।

রোকসানা বেগম

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে পিঠা উৎসব পালন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ২০-০১-২০১০ ঈসাব্দ রোজ বুধবার বিকাল ৪ ঘটিকায় এক পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম (মায়া) এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে পিঠা উৎসবের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই উৎসবে ১০ জন সদস্যা হরেক রকমের দেশীয় মজাদার পিঠা পরিবেশন করে। উৎসবে ৩২ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে উক্ত পিঠা পরিবেশন ও আপ্যায়নের মাধ্যমে পিঠা উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের বনভোজন অনুষ্ঠিত

গত ২৬ ডিসেম্বর শনিবার পটিয়ার আসিয়া গ্রামে লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে এক বনভোজন এর আয়োজন করা হয়। চা-নাস্তা পর্ব শেষে রান্নার আয়োজন শুরু হয়। রান্না শেষে যোহর ও আসর নামায জামাতে আদায় করা হয়। নামায পড়ান মিসেস সরিফা বদরউদ্দীন। আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের মুফাত্তেস মিসেস মাকসুদা ফারুক।

এ বনভোজনে সার্বিক সহযোগিতা করেন মিসেস নুসরাত নেসার। আল্লাহ্ তার পরিবারকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

রোকসানা বেগম

শুভ বিবাহ

গত ০৬/০২/২০১০ইং মিসেস নিগার সুলতানা এমি, পিতা-মোহাম্মদ শিশু মিয়া, কান্দিপাড়া বি, বাড়িয়া এর সাথে দেওয়ান আহমদ, পিতা-নজির আহমদ, কান্দিপাড়া বি, বাড়িয়া এর বিবাহ ৯৯,৯৯৯/- (নিরানব্বই হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮২৭/২০১০

গত ০৬/০২/২০১০ইং ফারজানা আফরোজ (নিপা), পিতা-সিরাজ উদ্দিন আহমদ, চট্টগ্রাম এর সাথে মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়, পিতা-মোহাম্মদ ওবায়েদ উল্লাহ্, সরাইল বি, বাড়িয়া এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮২৮/২০১০

গত ০৩/০৩/২০১০ইং মোছাম্মাৎ লিপি পারভীন, পিতা-জনাব আব্দুর রশিদ মোড়ল, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর সাথে জনাব তৌফিক আলম (বাবুল), পিতা-জনাব আব্দুল হাকিম মোল্লা, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮২৯/২০১০

শোক সংবাদ

দু:খের সাথে জানাচ্ছি, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আশুলিয়া (সাভার)-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ পিয়ার আলী সরকার গত ২১/০২/২০১০ইং রোজ রবিবার দিবাগত রাত ৩ টায় নিজ গৃহে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩ বৎসর। তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি ২ মেয়ে ৩ পুত্র ও ১৮ জন নাতি নাতনী রেখে যান।

উল্লেখ্য যে, মরহুম তবলীগের ময়দানে ছিলেন একজন বীর সৈনিক মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তবলীগ করে গেছেন এবং বহুবার শারিরীকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করে সকল আহমদী ভাই বোনের নিকট বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

দোয়াপ্রার্থী

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

بسم الله الرحمن الرحيم
আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।
ইলহাম-হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)
www.ahmadiyyabangla.org
পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায় খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও তাঁর সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ অন্যান্য বিষয়বস্তু
পড়ুন
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা
অমূল্য পুস্তকাদি
অমূল্য প্রবন্ধ
পাক্ষিক আহমদী
অন্যান্য প্রকাশনা
শুনুন
ঈমান উদ্দীপক বাংলা হামদ্, নাত ও অন্যান্য বাংলা নযম/কবিতা
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান (আসবে)
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) (আসবে)
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ (আসবে)
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান (আসবে)
দেখুন
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান (আসবে)
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) (আসবে)
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ (আসবে)
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান (আসবে)
আপনাদের দোয়া ও মূল্যবান মতামতের মাধ্যমে এ মহতী উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করুন
মতামত পাঠানোর ঠিকানা: info@ahmadiyyabangla.org
আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি

তুমি তখনই আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হবে, যখন তুমি তার বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবে
-আল হাদীস
গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন
ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

COMPLETE VIEW OF ADVANCED INDOOR OUTDOOR SIGNAGE & POP SYSTEMS
HSBC
TOYOTA
BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A,Chittagong
Tel: 683555
HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com
SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

New Vol. No. 72 ■ 18th Issue
Fortnightly

The AHMADI

31 March, 2010 ■ Tk. 15.00
Regd. No. D. A-12

ধানসিড়ি
রে স্তো রা ১
ধানসিড়ির রান্না- আপনার ঘরের রান্না

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ নীচতলা
তৃতীয় শাখা
এখন গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ নীচতলা	ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ ওয়ান্ডারল্যান্ড	ধানসিড়ি খাবার
রোড ৪৫ প্লট ৩২/১, গুলশান ২, ঢাকা ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩ ০১৯১১ ৭৬৪৩৩৯, ০১৯১৯ ২৭১২৮৬ ০১৭১৪ ২১৬৯১৫	পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পাশে রোড ১০৩, গুলশান ২, ঢাকা ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩ ০১৭১৪ ২১৬৯১৫, ০১৯১১ ৭৬৪৩৩৯ ০১৯১৯ ২৭১২৮৬	ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে) ঢাকা ফোন: ৯১৩৬৭২২ ০১৮১৯ ০৯৯০৩৫, ০১৭২৬ ৭৩৯৪৯৩

এছাড়া আমাদের অন্য কোথাও কোন শাখা নেই

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ এর রান্না আপনার ঘরের রান্না
মান ও পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা ১

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
Crest
Trophy
Sign Board
Metal Sign
Acrylic Letter
POP & Interior
Digital Printig

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz

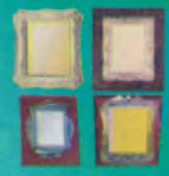

Specialist in Making Metal Crest, Trophy, Medal, Silver/Gold Coated Dish Model, Coat Pin, Key Ring, Plastic Sign, Poly Sign, Wooden & SS Febrication

A Home of Quality Crest Trophy & Gift Items

DHAKA HEAD OFFICE
H-79, Block # H/11 (1st Floor), Banani Chairman Bari, Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road Ctg. Tel : 682216

Printed and Published by Mahbub Hossain at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com